রোকেয়ানামা

সাজিদ হাসান[1]

(প্রোপাগান্ডা [2] বইয়ের লেখক)

‘জাগো গো ভগিনী!’

আসসালামু ‘আলাইকুম প্রিয় বোন/ভাই। কেমন আছেন আপনি? আশা করি আল্লাহর রহমতে নিশ্চয়ই ভালো আছেন। আপনার মনে হয়তো প্রশ্ন জেগেছে, একটা বইয়ের শুরুতেই আমি কেন আপনাকে জাগতে বললাম। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে তো আর আপনি বইটা পড়া শুরু করেননি, তাই না?

‘জাগো গো ভগিনী!’ এই আহ্বানখানি ‘বিখ্যাত’ বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের[১] বলা খুবই সুপরিচিত একটি লাইন। স্কুলে আপনি নিশ্চয়ই এই লাইনটি পড়েছেন। ‘অবরোধ-বাসিনী’, ‘সুলতানার স্বপ্ন’, ‘গৃহ’, ‘চাষার দুক্ষু’—রোকেয়ার এসব লেখার সাথেও হয়তো আপনি পরিচিত। আর আপনি হয়তো ‘**মুসলিম নারীজাগরণের অগ্রদূত**’ হিসেবেও বেগম রোকেয়াকে চিনেন।

রোকেয়া এমন একজন মানুষ, বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশক থেকে আরম্ভ করে আজ পর্যন্ত যার লেখা শিক্ষিত মুসলিম-অমুসলিমদের মাঝে বেশ আলোচিত-সমালোচিত। এমনকি একশো বছর পেরিয়ে আজও যার লেখা বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে প্রাসঙ্গিক করে রাখা হয়েছে। আপনি যখন ছোট ছিলেন, তখন স্কুল-মাদ্রাসায় পাঠ্যবইতে তাকে মহান মহীয়সী হিসেবে আপনার সাথে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়েছিল। এখনো আপনার ছোট ভাইবোনদেরকেও এভাবেই শেখানো হয়। তাই না?

এখন আপনার মনে হয়তো প্রশ্ন জাগতে পারে, বেগম রোকেয়াকে নিয়ে আমি কেন এতো হাউকাউ লাগিয়ে দিয়েছি। আছে, কারণ আছে। একটু ধৈর্য ধরে চলুন সামনের দিকে এগোই। কষ্ট করে একটু ইতিহাস পড়ে নিই। তাহলে

---

[১] (১৮৮০-১৯৩২)

পরের চ্যাপ্টারগুলো বোঝা আপনার জন্য পানির মতো সহজ হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ।

রোকেয়া যে তিনটি কারণে মুসলিম বাঙালি সমাজে সবচে বেশী আলোচিত, সেগুলো হল-

১. **‘নারী অধিকার’ প্রতিষ্ঠায় তার লেখনী**
২. **তার সাহিত্য কর্ম**
৩. **সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল প্রতিষ্ঠা, তথা সেকুলার নারীশিক্ষা প্রসারের উদ্দেশ্যে তার সামাজিক প্রচেষ্টা**

ব্রিটিশ উপনিবেশ আমলে (১৯৪৭-এর আগের বছরগুলোতে) ব্রিটিশদের অনুগত পশ্চিমা শিক্ষায় শিক্ষিত সমাজের অধিকাংশ সদস্য (মুসলিম, অমুসলিম দুই সম্প্রদায়ই) বেগম রোকেয়ার সাহিত্য কর্ম, নারী জাগরণের আহ্বানে অকুণ্ঠ সমর্থন জানিয়েছিল। তার প্রতি অতীত ও বর্তমান এলিট ক্লাসের সম্মানের আতিশয্যে মনে হয়, বেগম রোকেয়া ছিলেন মুসলিম বাঙালি নারীদের রক্ষার জন্য আসমান থেকে অবতরণ করা ‘**ঐশী দূত**’। যার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য ছিল মুসলিম নারীদেরকে মুসলিম সমাজের যুলুমের বেড়াজাল থেকে রক্ষা করা। রোকেয়ার সামগ্রিক সাহিত্য যদি আপনি পড়ে থাকেন, তাহলে আপনার মনে হবে, ইসলাম, পুরুষ ও আলিমদের সঙ্গে তার বিভিন্ন ব্যাপারে বেশ মতপার্থক্য ছিল। কারণ, তার প্রায় সব লেখনীতেই ইসলাম, পুরুষ ও আলিমদের প্রতি ক্ষোভ বেশ স্পষ্ট।

যাক সে কথা। বেগম রোকেয়ার লেখনী সম্পর্কে আলোচনা করার আগে তার সম্পর্কে বিশেষ উল্লেখযোগ্য তথ্যগুলো আপনাকে জানিয়ে রাখা প্রয়োজন। তাহলে তৎকালীন সমাজ কিংবা একশো বছর পর এসে আজকেও রোকেয়ার প্রাসঙ্গিকতা কতটুকু—সেটা বোঝা আপনার জন্য সহজ হবে।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে (১৮৮০ সাল) রংপুরের এক ধনাঢ্য ব্রিটিশবান্ধব মুসলিম বাবা-মায়ের ঘরে বেগম রোকেয়ার জন্ম। রোকেয়ার পিতার নাম জহীরুদ্দিন মোহাম্মদ আবু আলী হায়দার সাবের (মৃত্যু ১৯১৮)।

তিনি ছিলেন ব্রিটিশদের আজ্ঞাবাহী একজন জমিদার। সিপাহি বিপ্লবের সময় জমিদার আলী হায়দার সাবের ইংরেজ অথবা আইরিশ এক নারীকে বিয়ে করেন[২]। যদিও তখন তার ঘরে স্ত্রী-সন্তান ছিল। আলী সাবের তার বড় দুই ছেলেকে কলকাতার সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে পড়াশোনা করান।

রোকেয়ার বড়ভাই মোহাম্মদ ইবরাহিম ১৮৮৫ সালে সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ থেকে বিএ পাস করেন। তার পিতা যেমন ছিলেন ব্রিটিশ জমিদার, তেমনি তার বড় বোন করিমুন্নেসার বিয়েও হয় একজন জমিদারের সঙ্গেই[৩]। ওই বছরই (১৮৮৫) কলকাতায় বড় বোন করিমুন্নেসার শ্বশুর বাড়িতে থাকাকালীন বেগম রোকেয়া সেখানে ইউরোপিয়ান গভর্নেসের কাছেও কিছুদিন পড়াশোনা করেন। এভাবেই প্রাথমিক জীবনে ইউরোপিয়ান শিক্ষায় শিক্ষিত বড় দুই ভাই, বোন করিমুন্নেসা এবং মেম গভর্নেসের কাছে রোকেয়ার শিক্ষার সূচনা। অর্থাৎ, ছোট বেলা থেকেই ইউরোপীয় বা ব্রিটিশ সংস্কৃতির সঙ্গে বেগম রোকেয়ার পরিচয়।

১৮৯৮ সালে বেগম রোকেয়ার বিয়ে হয় ব্রিটিশদের কর্মচারী, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট খানবাহাদুর সৈয়দ সাখাওয়াত হোসেনের[৪] সঙ্গে। রোকেয়ার সঙ্গে **বিয়ের আগে সাখাওয়াত হোসেন ১৮৮৫ সালে বিলেতে পড়াশোনা করতে যান**। সেখানেই তিনি পশ্চিমা নারীদের সাথে মুসলিম নারীদের পর্দা ও অন্যান্য রীতিনীতির পার্থক্য স্বচক্ষে দেখতে পান। ওই সময় ব্রিটেনে নারীদের ভোটাধিকার ও অন্যান্য অধিকারের দাবীতে দীর্ঘ আন্দোলন চলমান ছিল। এসব কিছুই তিনি প্রত্যক্ষ করে দেশে ফিরে আসেন। দেশে ফিরে রোকেয়ার সঙ্গে বিয়ের পর স্ত্রীকেও পশ্চিমা কালচারের ট্রেনিং দিতে আরম্ভ করেন। রোকেয়ার শুরুর দিকের লেখাগুলো সাখাওয়াত হোসেনই প্রথম পড়তেন ও

---

[২] গোলাম মুরশিদ, (১৯৯৩). *নারীপ্রগতির একশো বছর; রাসসুন্দরী থেকে রোকেয়া.* অবসর

[৩] সোনিয়া নিশাত আমিন (২০০২). *বাঙালি মুসলিম নারীর আধুনিকায়ন.* বাংলা একাডেমী

[৪] জন্ম ১৮৫৮, মৃত্যু ১৯০৯

মন্তব্য করতেন, এ কথা তিনি নিজেই বলে গেছেন। অর্থাৎ, বেগম রোকেয়ার ‘প্রথা-বিরোধী’ চিন্তাভাবনার চূড়ান্ত বিপ্লব সাখাওয়াত হোসেনের হাতেই হয়েছে।

বিয়ের পর সাখাওয়াত হোসেন বেগম রোকেয়াকে যত্নের সঙ্গে ইংরেজি শেখান। বিহারের ভাগলপুরের সাখাওয়াত ছিলেন উর্দুভাষী, বাংলায় তার দখল অতটা ছিল না। সব মিলিয়ে করিমুন্নেসার কাছে বাংলা, ভাই ও স্বামীর কাছে ইংরেজির উচ্চতর শিক্ষা পান তিনি। ফলে একই সঙ্গে বাংলা, উর্দু, ফার্সি, আরবি ও ইংরেজি ভাষায় তার দক্ষতা আসে। সে সময়ে মুসলিমরা সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশদের ইংরেজি ভাষাশিক্ষাকে নিন্দনীয় মনে করতো। তাই, রোকেয়ার পাঁচ ভাষা শিক্ষার এ সুযোগকে বেশ দুর্লভই বলা চলে।

বেগম রোকেয়া নিয়মিত ইংরেজি পত্রিকা ও বই পড়তেন। এসব সম্ভবত তার স্বামীর বদৌলতে তার হাতে পৌঁছুত। গ্যালিলিও, নিউটন, John Howard Payne, Marie Corelli সহ অতীত ও তৎকালীন অনেক জনপ্রিয়, অজনপ্রিয় ইউরোপীয় ব্যক্তি ও সাহিত্যিকের কর্ম, সাহিত্যের সঙ্গেই তার পরিচয় ছিল। তার লেখায় বিজ্ঞানের তৎকালীন অনেক জটিল বিষয়েরও উল্লেখ পাওয়া যায়। যাতে বোঝা যায়, রোকেয়ার ইংরেজি পড়ার সীমা নিতান্ত কম ছিল না। তার অনেক প্রবন্ধের সঙ্গে পশ্চিমা অনেক সাহিত্যিকের মূলভাবের সাদৃশ্যও দেখা যায়[৫] । তাই এ কথা বলা ভুল হবে না যে, নারীমুক্তির যে আদর্শ তিনি তার লেখনীতে তুলে ধরেছেন, সে আদর্শের পরিচয় ও শিক্ষা তিনি পশ্চিমা লেখকদের কাছ থেকেই লাভ করেন[৬]।

বেগম রোকেয়া দুজন সন্তান জন্মদান করেছিলেন। দুর্ভাগ্যজনকভাবে দুজনই শৈশবে মৃত্যুবরণ করে। তাই আমৃত্যু তিনি নিঃসন্তান হিসেবেই জীবনযাপন

---

[৫] এখানে চিন্তার অবকাঠামো গঠনের কথা বলা হয়েছে। সাহিত্যকর্ম চুরির অভিযোগ করা হয়নি।

[৬] গোলাম মুরশিদ, (১৯৯৩). *নারীপ্রগতির একশো বছর; রাসসুন্দরী থেকে রোকেয়া.* অবসর

করেন। ১৯০৯ সালে রোকেয়ার স্বামী সাখাওয়াত হোসেন মারা যান। পাঁচ মাস পর রোকেয়া পাঁচজন ছাত্রী নিয়ে বিহারের ভাগলপুরে 'সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল' প্রতিষ্ঠা করেন। পারিবারিক সমস্যার কারণে পরবর্তীতে ভাগলপুর ছেড়ে ১৯১১ সালে কলকাতায় একই নামে আবারো স্কুল প্রতিষ্ঠিত করেন। বেগম রোকেয়ার জীবদ্দশায় বাংলা ভাষাভাষী ছাত্রীর অভাবে স্কুলে বাংলা ভাষায় শিক্ষাদান চালু করা সম্ভব হয়নি। শুরুতে শুধু উর্দু এবং পরবর্তীতে ১৯১৭ সালে ইংরেজি ভাষায় পাঠদান আরম্ভ হয়[৭]। ১৯১৬ সালে তিনি 'আনজুমানে-খাওয়াতীনে ইসলাম' নামে নারীদের একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন।

বেগম রোকেয়া ***মতিচূর*** ১ম খণ্ড (১৯০৪), ***Sultana's Dream*** (১৯০৮), ***মতিচূর*** ২য় খণ্ড (১৯২২), ***পদ্মরাগ*** (১৯২৪) ও ***অবরোধ-বাসিনী*** (১৯৩১)—এ পাঁচটি বই ছাড়াও অনেক প্রবন্ধ ও অন্যান্য শাখায় লিখেছেন। যেগুলোর উল্লেখযোগ্য একটা অংশই তৎকালীন জনপ্রিয় সব পত্রিকায় ছাপা হয়। ১৯৩২ সালে বেগম রোকেয়া কলকাতায় মৃত্যুবরণ করেন।

এই হল বেগম রোকেয়ার জীবনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। চলুন, এবার তাহলে সামনে আগানো যাক।

---

[৭] বেগম রোকেয়া, (১৯৯৯). *রোকেয়া রচনাবলী.* বাংলা একাডেমী, পৃষ্ঠা ৫৩৪

রোকেয়ার লেখনীর পোস্টমর্টেম

বেগম রোকেয়া নারীজাতির উদ্দেশ্যে যা কিছু লিখেছেন, বইপুস্তকে প্রশংসার ফুলঝুরির বদৌলতে তার ভালো(!) দিকগুলো প্রায় সবই তো আপনি আমি জানি। তবে, অদ্ভুত হলেও সত্য, তার লেখনীর আসল রূপ কোন অজানা এক কারণে আজ পর্যন্ত আপনার দৃষ্টির আড়ালে রয়ে গেছে। এটা কি অনিচ্ছাকৃত ভুল, নাকি পরিকল্পিত, নাকি মুসলিমদের অজ্ঞতারই ফলাফল—তা আমার জানা নেই। তবে, এখন যখন আমি জানতে পেরেছি, আপনাকে জানাতে দোষ কি?

একটা তেতো কিন্তু সত্যি কথা বলি, কেমন? রাগ করা যাবে না কিন্তু। কথাটা হল, রোকেয়ার লেখনীর কিন্তু অনেক অন্ধকার দিকও আছে। তার সেসব অন্ধকার থেকে উঠে আসা লেখনীর উদ্দেশ্য ও প্রভাব সম্পর্কে আমাদের এ অজ্ঞতার খেসারত তো এক শতাব্দী ধরেই মুসলিমবঙ্গের মানুষেরা—বিশেষ করে নারীরা—দিয়ে যাচ্ছে।

আহহা! আগেই দেখি রেগে যাচ্ছেন। "এতো বড় মহীয়সী নারী, তার বিরুদ্ধে এই নাদান লোকটা কি সব বলে যাচ্ছে! এর নিশ্চয়ই মাথা খারাপ হয়েছে। আর নয়তো পেট গোলমাল।"

দাঁড়ান বোন। কথাটা একটু শুনুন। তখন যদি মনে হয়, আমি ভুল কিছু বলেছি, তারপর না হয় আমাকে যা ইচ্ছা শাস্তি দিবেন।

'রোকেয়া রচনাবলী' বিস্তারিত পড়তে গিয়ে এতো এতো বিস্ময়কর তথ্য আমি পেয়েছি, সেগুলো আপনাকে না জানালে তা রীতিমত ঈমানী অপরাধের

পর্যায়ে পড়বে। তাই তো আপনার গালি খাওয়ার আশংকার কথা মাথায় রেখেও কথাগুলো বলছি।

রোকেয়া কি এমন কথা বলেছে, কাজ করেছে, যার জন্য রীতিমত বই লিখে আপনাকে সচেতন করতে হচ্ছে? এক অনুচ্ছেদে তো আর সব বলা সম্ভব নয়। একে একে বলি।

"ঈমান" হত্যা

বেগম রোকেয়ার লেখা সর্বপ্রথম প্রবন্ধের নাম '**পিপাসা**'। 'নবপ্রভা' পত্রিকায় বাংলা ১৩০৮ সালের ফাল্গুনে 'পিপাসা' লেখাটি প্রকাশিত হয়। কারবালার প্রান্তরে হুসাইন রাঃ-এর সপরিবারে শাহাদাতের হৃদয়বিদারক ঘটনার চিত্রায়ন এই প্রবন্ধটি। যদি সাধু ভাষা ভালো লাগে, পড়ে দেখতে পারেন। আপনার তো বটেই, যে কারোই মন গলে যাবে। চোখের কোণে দুয়েক ফোঁটা অশ্রুও হয়তো জমা হবে মনের অজান্তে। আহা, কতই না মহীয়সী সে নারী, মুসলিমদের দুঃখের ইতিহাসকে যিনি কলমের কালিতে এঁকে পাঠকের মনকে এভাবে নাড়া দিতে পারেন।

কিন্তু, দুঃখের বিষয় এই যে, সব সকালের সূর্যই তো আর সারা দিনের চিত্র ফুটিয়ে তুলতে পারে না। নিজের জীবদ্দশায় আপনার, আপনার বোন-ভাতিজী-বান্ধবীদের, অর্থাৎ **ভারত-বাংলার মুসলিম নারীদের প্রথম ও সবচে বড়** যে **ক্ষতি** তিনি করেছেন, সেটি হল—**বেগম রোকেয়াই এ অঞ্চলের মানুষদের প্রথম ইরতিদাদ বা ধর্মত্যাগের শিক্ষা দেন**। তার আগে সরাসরি এ জঘন্য কাজের আর কোন উদাহরণ সম্ভবত ভারতবাসী দেখেনি।

বেগম রোকেয়ার প্রকাশিত দ্বিতীয় লেখা '**অলংকার না badge of slavery**'। এই লেখাটি আপনি খুব সম্ভবত কখনো পড়েননি। হয়তো এর নামও শোনেননি। কিন্তু, বাস্তবতা হল, এটিই বেগম রোকেয়ার জীবনের সবচে

গুরুত্বপূর্ণ লেখনী। কারণ, এই প্রবন্ধে তিনি তার ভবিষ্যৎ জীবনের সকল চিন্তা ও কাজের সারমর্ম তুলে এনেছেন।

১৩১০ বঙ্গাব্দের বৈশাখ, ইংরেজিতে মে ১৯০৩। ওই সময় বেগম রোকেয়ার বয়স সর্বোচ্চ ২৩ অথবা ২৪। গিরিশচন্দ্র সেন সম্পাদিত ***'মহিলা'*** নামের পত্রিকায় পর পর তিনটি সংখ্যায় বেগম রোকেয়ার '**অলংকার না badge of slavery**' প্রবন্ধটি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। এই প্রবন্ধতে বেগম রোকেয়া যেসব ভয়ানক কথা লিখেছেন, সেগুলো থেকে বাছাইকৃত উদ্ধৃতিগুলো আপনার খেদমতে পেশ করছি—

এক

অলঙ্কার না Badge of slavery?

ভগিনীগণ! তোমরা কি কোনদিন আপনার দুর্দশার বিষয় চিন্তা করিয়া দেখিয়াছ? এই বিংশ শতাব্দীর সভ্যসমাজে আমরা কি, দাসী!! পৃথিবী হইতে দাস-ব্যবসায় উঠিয়া গিয়াছে শুনিতে পাই, কিন্তু আমাদের দাসত্ব গিয়াছে কি? আমরা যে নরাধীন সেই নরাধীন! দিদীমাদের মুখে শুনি যে, নারী নরের অধীন থাকিবে, ইহা ঈশ্বরেরই অভিপ্রেত— তিনি প্রথমে পুরুষ সৃষ্টি করিয়াছেন, পরে তাহার সেবা শুশ্রূষার নিমিত্ত রমণীর সৃষ্টি হয়। কিন্তু একথার আমার সন্দেহ আছে। কারণ দিদীমাদের এ জ্ঞান পুরুষের নিকট হইতে গৃহীত। তাঁহারা ত বলিবেনই যে, রমণী কেবল পুরুষের সুখ শান্তিদাত্রিরূপে জন্মগ্রহণ করে।

"দিদীমাদের মুখে শুনি যে, নারী নরের অধীন থাকিবে, ইহা ঈশ্বরেরই অভিপ্রেত— তিনি প্রথমে পুরুষ সৃষ্টি করিয়াছেন, পরে তাহার সেবা শুশ্রূষার নিমিত্ত রমণীর সৃষ্টি হয়। **কিন্তু একথায় আমার সন্দেহ আছে**। কারণ **দিদীমাদের এ জ্ঞান পুরুষদের নিকট হইতে গৃহীত**।"

অথচ মহান আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে বলেন,

"স্মরণ কর, তোমার প্রতিপালক যখন ফেরেশতাদেরকে বললেন, 'আমি যমীনে প্রতিনিধি সৃষ্টি করছি'; তারা বলল, 'আপনি কি সেখানে এমন কাউকেও পয়দা করবেন যে অশান্তি সৃষ্টি করবে ও রক্তপাত ঘটাবে? আমরাই তো আপনার প্রশংসামূলক তাসবীহ পাঠ ও পবিত্রতা ঘোষণা করি'। তিনি বললেন, 'আমি যা জানি, তোমরা তা জান না'।

এবং তিনি আদাম (আ.)-কে সকল বস্তুর নাম শিক্ষা দিলেন, তারপর সেগুলো ফেরেশতাদের সামনে উপস্থাপন করলেন এবং বললেন, 'এ বস্তুগুলোর নাম আমাকে বলে দাও, যদি তোমরা সত্যবাদী হও'।"

(সূরা বাকারা ৩০-৩১)

"তিনিই তোমাদেরকে এক ব্যক্তি হতে সৃষ্টি করেছেন আর **তাথেকে তার জোড়া সৃষ্টি করেছেন যাতে সে তার কাছে শান্তি পায়**। যখন সে স্ত্রীর সাথে সঙ্গত হয় তখন সে লঘু গর্ভধারণ করে আর তা নিয়ে চলাফেরা করে। গর্ভ যখন ভারী হয়ে যায় তখন উভয়ে তাদের প্রতিপালক আল্লাহকে ডেকে বলে, 'যদি তুমি আমাদেরকে (গঠন ও স্বভাবে) ভাল সন্তান দান কর তাহলে আমরা কৃতজ্ঞ থাকব।"

(সূরা আরাফ-১৮৯)

কুরআনে আল্লাহ কত সুন্দর করে প্রথম আদাম আঃ ও পরে তার শান্তির জন্য নারী অর্থাৎ হাওয়া আঃ-কে সৃষ্টির কথা বর্ণনা করেছেন। কিন্তু বেগম রোকেয়া বলেন, তিনি এটি বিশ্বাস করেন না। অর্থাৎ, তার মতে, আল্লাহ যে আদম আঃ-কে প্রথমে সৃষ্টি করেছেন, তারপর আদম আঃ-এর শান্তির জন্য সৃষ্টি করেছেন হাওয়া আঃ-কে, কুরআনের এই আয়াতগুলো পুরুষদের বানানো মিথ্যা গল্প (নাউযুবিল্লাহ)।

২১ আমাদিগকে প্রতারণা করিবার নিমিত্ত পুরুষগণ ঐ ধর্ম্মগ্রন্থগুলিকে "ঈশ্বরের আদেশপত্র" বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। কোন বিশেষ ধর্ম্মের নিগূঢ় মর্ম্ম বা আধ্যাত্মিক বিষয় আমরা আলোচ্য নহে—ধর্ম্মে যে সামাজিক আইনকানুন বিধিবদ্ধ আছে, আমি কেবল তাহারই আলোচনা করিব, সুতরাং ধার্ম্মিকগণ নিশ্চিন্ত থাকুন। পুরাকালে যে ব্যক্তি প্রতিভাবলে দশজনের মধ্যে পরিচিত হইয়াছেন, তিনিই আপনাকে ঈশ্বরপ্রেরিত দূত কিংবা

পরিশেষ ৬১১

দেবতা বলিয়া প্রকাশ করিয়া অসভ্য বর্ব্বরদিগকে শাসন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। ক্রমে যেমন পৃথিবীর অধিবাসীদের বুদ্ধি বিবেচনা বৃদ্ধি হইয়াছে, সেইরূপ পয়গম্বরদিগকে (ঈশ্বরপ্রেরিত মহোদয়দিগকে) এবং দেবতাদিগকেও বুদ্ধিমান হইতে বুদ্ধিমত্তর দেখা যায়!

"আমাদিগকে প্রতারণা করিবার নিমিত্ত পুরুষগণ ঐ ধর্মগ্রন্থগুলিকে "ঈশ্বরের আদেশপত্র" বলিয়া প্রচার করিয়াছেন। ...**পুরাকালে যে ব্যক্তি প্রতিভাবলে দশজনের মধ্যে পরিচিত হইয়াছেন, তিনিই আপনাকে ঈশ্বরপ্রেরিত দূত কিংবা দেবতা বলিয়া প্রকাশ করিয়া অসভ্য বর্বরদিগকে শাসন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন।** ক্রমে যেমন পৃথিবীর অধিবাসীদের বুদ্ধি বিবেচনা বৃদ্ধি হইয়াছে, **সেইরুপ পয়গম্বরদিগকে** (ঈশ্বরপ্রেরিত মহোদয়দিগকে) এবং দেবতাদিগকেও **বুদ্ধিমান হইতে বুদ্ধিমত্তর দেখা যায়!**"

রোকেয়া এখানে বেশ কয়েকটি মারাত্মক দাবি করেছেন।

প্রথমত, নারীদের প্রতারিত করতে পুরুষরা তাওরাত, ইঞ্জিল, কুরআনসহ সকল আসমানী কিতাবকে আল্লাহর নাযিলকৃত আদেশগ্রন্থ বলে প্রচার করে। আদতে সেগুলো আল্লাহর নাযিলকৃত আসমানি কিতাব নয় (নাউযুবিল্লাহ)।

দ্বিতীয়ত, পয়গম্বর বা নবীরা মহান আল্লাহর প্রেরিত দূত নয়। বরং তারা সবাই ছিল ভণ্ড, প্রতারক, মিথ্যা নবুয়তের দাবিদার (নাউযুবিল্লাহ)। নিজেদের সময়কার অসভ্য বর্বর মানুষদের মধ্যে সবচাইতে চতুর ও বুদ্ধিমান ছিলেন তারা। তাই কুটিল বুদ্ধি খাটিয়ে তারা অপেক্ষাকৃত মূর্খ ও বোকাদের মাঝে নিজেদের পয়গম্বর বলে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছেন!

রোকেয়ার মতে, এর প্রমাণ হল—যুগে যুগে মানুষ আগের যুগের মানুষদের চাইতে বেশী জ্ঞান অর্জন করেছে। তাই সেই সময়কার সবচে চতুর পয়গম্বর বা নবীদেরকেও সময়ের পরিক্রমায় আগের যুগের নবীদের চাইতে বেশী বুদ্ধিমান দেখা গেছে (যেমন ধরুনঃ ইবরাহিম আঃ ছিলেন ঈসা আঃ ও রাসূল সাঃ-এর যুগেরও অনেক আগের নবী। স্বাভাবিকভাবেই ইবরাহিম-এর সময়ের মানুষদের যে জ্ঞান ছিল, তার চাইতে পরবর্তী সময়ের ঈসা আঃ, মুহাম্মাদ সাঃ-এর আমলে মানুষদের বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ছিল বেশী। রোকেয়া যা বলতে চেয়েছেন তা হল, সমসাময়িক আপডেটেড তথ্য কাজে লাগিয়ে তারা নিজেদের সময়কার অধিক জ্ঞানী মানুষদেরকেও বোকা বানাতে পেরেছেন। সেজন্যই দেখা যায়, ইবরাহিম আঃ-এর তুলনায় ঈসা আঃ, মুহাম্মাদ সাঃ অধিক জ্ঞানী)! নাউযুবিল্লাহ।

এবার চলুন, কুরআনে আল্লাহ তাআলা নবী-রাসূল প্রেরণের ব্যাপারে কি বলেছেন দেখে আসি,

“প্রত্যেক জাতির জন্য (পাঠানো হয়েছে) একজন রসূল। তাদের রসূল যখন এসেছে তখন ন্যায়পরায়ণতার সঙ্গে তাদের মাঝে ফায়সালা করা হয়েছে। তাদের প্রতি কোন যুলম করা হয়নি।”

(সূরা ইউনুস ১০:৪৭)

আসমানি কিতাবের ব্যাপারে আল্লাহ্ তাআলা সুস্পষ্ট ভাষায় বলেছেন,

"তোমরা নিজেদের মুখ পূর্ব দিকে কর কিংবা পশ্চিম দিকে এতে কোন কল্যাণ নেই বরং **কল্যাণ আছে এতে যে, কোন ব্যক্তি ঈমান আনবে আল্লাহ,** শেষ দিবস, ফেরেশতাগণ, **কিতাবসমূহ ও নাবীগণের প্রতি** এবং আল্লাহর ভালবাসার্থে ধন-সম্পদ আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম-মিসকীন, মুসাফির ও যাচ্ঞাকারীদের এবং দাসত্বজীবন হতে নিস্কৃতি দিতে দান করবে এবং নামায কায়িম করবে ও যাকাত দিতে থাকবে, ওয়া'দা করার পর স্বীয় ওয়া'দা পূর্ণ করবে এবং অভাবে, দুঃখ-ক্লেশে ও সংকটে ধৈর্য ধারণ করবে, এ লোকেরাই সত্যপরায়ণ আর এ লোকেরাই মুত্তাকী।"

(সূরা বাকারা ০২:১৭৭)

আল্লাহ্ তাআলা আরও বলেন,

"তোমরা বল, 'আমরা আল্লাহর উপর ঈমান এনেছি এবং যা আমাদের প্রতি নাযিল করা হয়েছে এবং যা ইবরাহীম ও ইসমাঈল এবং ইসহাক ও ইয়াকূব ও বংশধরদের প্রতি অবতীর্ণ করা হয়েছে এবং যা মূসা ও 'ঈসাকে দেয়া হয়েছে আর যা অন্যান্য নাবীগণকে তাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে দেয়া হয়েছে (এ সবের প্রতিও ঈমান এনেছি), আমরা এদের মধ্য হতে কোন একজনের ব্যাপারেও কোন পার্থক্য করি না এবং আমরা তাঁরই কাছে আত্মসমর্পিত'।"

(সূরা বাকারা ০২:১৩৬)

অথচ, বেগম রোকেয়া কত অনায়াসেই না সকল রাসূল ও কিতাবকে অস্বীকার করে ফেললেন!

২৩ ক্রমে জগতের বুদ্ধি বেশী হওয়ায় সুচতুর প্রতিভাশালী পুরুষ দেখিলেন যে, "পয়গম্বর" বলিলে আর লোকে বিশ্বাস করে না। তখন মহাত্মা ঈশা আপনাকে দেবতার অংশবিশেষ (ঈশ্বরপুত্র !) বলিয়া পরিচিত করিয়া ইঞ্জিল গ্রন্থ রচনা করিলেন। তাহাতে লেখা হইল, "নারী পুরুষের সম্পূর্ণ অধীনা—নারীর সম্পত্তিতে স্বামী সম্পূর্ণ অধিকারা।" আর বুদ্ধি–বিবেকহীনা নারী তাই মানিয়া লইল।

আমাদের ভালোবাসার রাসূল, পবিত্র কুমারী মাতার সন্তান, মুহাম্মাদ সাঃ-এর আগমনের সুসংবাদ দানকারী ঈসা ইবনে মারইয়াম আঃ সম্পর্কে বেগম রোকেয়া বলেন,

"ক্রমে জগতের বুদ্ধি বেশী হওয়ায় সুচতুর প্রতিভাশালী পুরুষ দেখিলেন যে, "পয়গম্বর" বলিলে আর লোকে বিশ্বাস করে না। তখন **মহাত্মা ঈশা আপনাকে অবতারের অংশবিশেষ** (ঈশ্বরপুত্র!) **বলিয়া পরিচিত করিয়া ইঞ্জিল গ্রন্থ রচনা করিলেন**। তাহাতে লেখা হইল, "নারী পুরুষের সম্পূর্ণ অধীনা—নারীর সম্পত্তিতে স্বামীর সম্পূর্ণ অধিকার।" আর **বুদ্ধি-বিবেকহীনা নারী তাই মানিয়া লইল**।"

এখানে বেগম রোকেয়া আরও মারাত্মক কথা বলে বসেন। তার দাবি, পৃথিবীতে আগত সকল নবীই ভণ্ডামি করে নিজেদেরকে আল্লাহর প্রেরিত পুরুষ হিসেবে দাবি করেছে। তাই একটা সময় পর ধোঁকা খেতে খেতে সাধারণ মানুষ আর বোকা রইলো না। ফলে, কোন নবী নিজেকে আল্লাহর প্রেরিত পুরুষ বলে দাবি করলে লোকে সে মিথ্যা দাবীতে বিশ্বাস করা বন্ধ করে দিলো!

আর তাই, সুচতুর(!) ঈসা আঃ সন্দেহপ্রবণ মানুষদের প্রতারিত করতে নিজের মর্যাদা(!) আরও এক ধাপ বাড়িয়ে নিলেন। সরাসরি নিজেকে আল্লাহর অংশ বলে দাবি করে বসলেন। এরপর নিজে নিজেই ইঞ্জিল রচনা করলেন (অর্থাৎ, ঈসা আঃ আল্লাহর প্রেরিত দূত নয়। বরং তিনি একজন ভণ্ড, প্রতারক। আর, ইঞ্জিল আল্লাহর প্রেরিত ঐশী কিতাব নয়। নাউযুবিল্লাহ)।

ইঞ্জিল লেখার সময় তিনি সেখানে নারীদের শোষণ করতে অন্যায্য বিধান ঢুকিয়ে দিলেন। আর বুদ্ধি বিবেকহীনা নারীরা ঈসা আঃ-এর সেসব মিথ্যাচার বিশ্বাস করে নিলেন (নাউযুবিল্লাহ)!

অথচ ঈসা আঃ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তাআলা বলেন,

“এবং নিশ্চয়ই আমি মূসাকে কিতাব দিয়েছি এবং তার পরে ক্রমান্বয়ে রসূলদেরকে প্রেরণ করেছি, মারইয়াম পুত্র **ঈসাকে সুস্পষ্ট প্রমাণ দিয়েছি** এবং ‘পবিত্র আত্মা’ যোগে (জিবরাঈলের মাধ্যমে) তাকে শক্তিশালী করেছি, অতঃপর যখনই কোন রসূল এমন কিছু এনেছে যা তোমাদের মনঃপুত নয়, তখনই তোমরা অহংকার করেছ এবং কিছু সংখ্যককে অস্বীকার করেছ এবং কিছু সংখ্যককে হত্যা করেছ।”

(সূরা আল বাকারাহ ০২:৮৭)

ঈসা আঃ-এর উপর যে ইনজিল নাযিল হয়েছিল[৮], তার উপর ঈমান আনাও মুসলিম হওয়ার জন্য ফরয। আল্লাহ্ তাআলা বলেন,

“বল, ‘আমরা আল্লাহর উপর এবং আমাদের প্রতি ও ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকুব এবং তাঁর বংশধরের প্রতি যা কিছু অবতীর্ণ হয়েছে এবং মূসা, ঈসা ও অন্যান্য নাবীগণকে তাঁদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে যা কিছু দেয়া হয়েছে তার উপর ঈমান এনেছি; আমরা তাঁদের মধ্যে কোন পার্থক্য করি না এবং আমরা তাঁরই কাছে আত্মসমর্পিত।”

(সূরা আলে-ইমরান ০৩:৮৪)

কিন্তু, কুরআনের সুস্পষ্ট এসব হুকুমকে বেগম রোকেয়া তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিয়ে ঈসা আঃ-এর নামে মিথ্যা অপবাদ দেওয়ার স্পর্ধা দেখালেন। আর এমন স্পর্ধা দেখানোর পুরস্কারস্বরূপ ইসলাম-বিদ্বেষীরা রোকেয়াকে মাথায় তুলে

---

[৮] বিকৃত বাইবেল নয়

নাচতে নাচতে কখন যে তাকে আমাদের মাথায় তুলে দিলো, সেই রহস্যটা রহস্যই রয়ে গেল।

চার

২৪ তারপর মহাত্মা মহম্মদ আইন প্রস্তুত করিলেন যে, "রমণী সর্ব্বদাই নরের অধীনা থাকিবে, বিবাহের পূর্ব্বে পিতা কিংবা ভ্রাতার অধীনা, বিবাহের পর স্বামীর অধীনা, স্বামী অভাবে পুত্রের অধীনা থাকিবে।" আর মূর্খ নারী নত মস্তকে ঐ বিধান মানিয়া লইল।

"তারপর মহাত্মা **মহম্মদ আইন প্রস্তুত করিলেন** যে, "রমণী সর্ব্বদাই নরের অধীনা থাকিবে, বিবাহের পূর্বে পিতা কিংবা ভ্রাতার অধীনা, বিবাহের পর স্বামীর অধীনা, স্বামী অভাবে পুত্রের অধীনা থাকিবে।" আর **মূর্খ নারী নত মস্তকে ঐ বিধান মানিয়া লইল**।"

প্রিয় বোন। উপরের লেখাটা আরও একবার পড়ুন। বেগম রোকেয়া এখানে কি বলতে চেয়েছে, খুব ভালো করে বুঝুন।

এ কয়টা বাক্য তার সবচে মারাত্মক স্পর্ধার প্রকাশ। ইসলামের মৌলিক ইলম থাকার পরও উপরের দাবিগুলোতে কেউ সুস্থ মস্তিষ্কে, সজ্ঞানে সায় দিলে মুহূর্তের ব্যবধানে ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে যাবে। আর এই লেখাগুলোর দ্বারা এটাও স্পষ্ট হয়ে যায় যে, রাসূল ﷺ-এর উপর, ইসলামের বিধি-বিধানের উপর রোকেয়ার এক বিন্দু পরিমাণ ঈমান ছিল না।

তিনি এখানে দাবি করেছেন, রাসূল সাঃ নারীদের মূর্খ পেয়ে নিজ থেকে অন্যায় বিধান তৈরি করে তাদের উপর চাপিয়ে দিয়েছেন!

অর্থাৎ, তার এই দাবি মেনে নিলে আপনাকে বলতে হবে,

- রাসূল সাঃ আল্লাহর প্রেরিত নবী ছিলেন না।
- যেহেতু তিনি আল্লাহর প্রেরিত কেউ নন, সেহেতু তিনি ভণ্ড, মিথ্যুক।
- তাঁর বলা কথা (অর্থাৎ হাদিস সমূহ) সব বানোয়াট, আল্লাহর সাথে সেসবের কোন সম্পর্ক নেই।
- নারী সাহাবীগণ সবাই ছিলেন মূর্খ। বেগম রোকেয়া তাদের সেই মূর্খতা ধরতে পেরেছেন।

নাউযুবিল্লাহ। প্রতিটা কথা কতটা জঘন্য, একবার ভেবে দেখুন তো! প্রিয় বোন, বুঝতে পারছেন, রোকেয়ার চিন্তার ভয়াবহতা কোন পর্যায়ে ছিল? আর কাকেই বা '**মুসলিম নারী জাগরণের অগ্রদূত**' বলে আপনার, আমার, গোটা জাতির ব্রেইনওয়াশ করা হয়েছে?

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রেরিত সম্মানিত রাসূল সাঃ ও কুরআন সম্পর্কে অজস্র আয়াত নাযিল করেছেন। সব তো আর এখানে দেওয়া সম্ভব হবে না, কিছু আয়াত আপনাদের জন্য দেই,

"আমি তোমাকে সত্যদ্বীনসহ সুসংবাদদাতা এবং ভয় প্রদর্শনকারী হিসেবে প্রেরণ করেছি, জাহান্নামীদের সম্বন্ধে তোমাকে কোন প্রশ্ন করা হবে না।"

(সূরা বাকারা ০২:১১৯)

"আমি তোমাকে সমগ্র মানবমন্ডলীর জন্য সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করেছি, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না।"

(সূরা সাবা ৩৪:২৮)

"যে রসূলের আনুগত্য করল, সে তো আল্লাহরই আনুগত্য করল, কেউ মুখ ফিরিয়ে নিলে (জোরপূর্বক তাকে সৎপথে আনার জন্য) আমি তোমাকে তাদের প্রতি পাহারাদার করে পাঠাইনি।"

(সূরা নিসা ০৪:৮০)

“এটা ঐ (মহান) কিতাব যাতে কোন সন্দেহ নেই, মুত্তাকীদের জন্য পথ নির্দেশ।”

(সূরা বাকারা ০২:০২)

শুধু এই আয়াতগুলোই নয়। আরও বহু আয়াত রয়েছে, যেখানে রাসূল সাঃ ও কুরআন সম্পর্কে সুস্পষ্ট ঘোষণা এসেছে। আল্লাহ্ তাআলা রাসূলের (সাঃ) বলা শরিয়াহ ও জীবনের সকল বিধানের ব্যাপারে মুমিনদের আচরণ কেমন হবে, সে সম্পর্কেও সতর্ক করে বলেন,

“মু’মিনদেরকে যখন তাদের মাঝে ফয়সালা করার জন্য আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের দিকে ডাকা হয়, তখন মু’মিনদের জওয়াব তো এই হয় যে, তারা বলে, আমরা শুনলাম ও মেনে নিলাম, আর তারাই সফলকাম।”

(সূরা আন-নূর ২৪:৫১)

অর্থাৎ, আল্লাহর রাসূল (সাঃ) যা বলবেন, তাতে কোন সন্দেহ করা যাবে না। মুমিনদের কর্তব্য হল, শোনামাত্র এ কথা বলা যে, “আমরা শুনলাম ও মেনে নিলাম”। আর তা নির্দ্বিধায় মেনে নেওয়া। এবং তারাই সফল, যারা এ পথ অবলম্বন করে।

নারীরা পুরুষদের নিরাপত্তার চাদরে সবসময় সুরক্ষিত থাকবেন। এর ফয়সালা জমীনে নয়, আসমান থেকে হয়েছে। আল্লাহ্ তাআলা পবিত্র কুরআনে বলেন,

“**পুরুষগণ নারীদের উপর কর্তৃত্বশীল** এ কারণে যে, **আল্লাহ্ তাদের এককে অন্যের উপর মর্যাদা প্রদান করেছেন**, আর এজন্য যে, পুরুষেরা স্বীয় ধন-সম্পদ হতে ব্যয় করে। ফলে **পুণ্যবান স্ত্রীরা** (আল্লাহ্ ও স্বামীর প্রতি) **অনুগতা থাকে** এবং পুরুষের অনুপস্থিতিতে তারা তা (অর্থাৎ তাদের সতীত্ব ও স্বামীর সম্পদ) সংরক্ষণ করে যা আল্লাহ্ সংরক্ষণ করতে আদেশ দিয়েছেন...।”

(সূরা নিসা ০৪:৩৪)

অর্থাৎ, পুরুষরা যে নারীদের উপর কতৃত্বশীল, এটা আল্লাহ তাআলার নির্দেশ। আর পুরুষ ও নারী—উভয়ের উপর কতৃত্বশীল আমাদের রব, মহান আল্লাহ তাআলা। কেয়ামতের আগ পর্যন্ত আর কখনোই এই নির্দেশ বদলাবে না।

অথচ বেগম রোকেয়া কটাক্ষ করে বলেন, নারী যে সবসময় পুরুষের—পিতা, ভাই, স্বামী অথবা সন্তান—অধীন থাকবে, এটি আল্লাহর বিধান নয়। রাসূল সাঃ এই আইন নিজের মর্জি মতো তৈরি করে তৎকালীন মূর্খ নারীদেরকে—খাদিজা রাঃ, আয়েশা রাঃ, ফাতিমা রাঃ সহ সকল নারী সাহাবীদের—বোকা বানিয়েছেন। আর উম্মাহাতুল মুমিনীনসহ যেসব বিদুষী নারী সাহাবীদের আমরা আজ শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি, যাদের উপর স্বয়ং সর্বশক্তিমান আল্লাহ তাআলা সন্তুষ্ট ছিলেন, সেসব বুদ্ধিহীনা(!) নারী সাহাবীরা রাসূল সাঃ-এর বানোয়াট কথাবার্তা নিজেদের মূর্খতাপ্রসূত কোন প্রতিবাদ ছাড়াই মেনে নিয়েছেন (নাউযুবিল্লাহ)।

পাঁচ

২৫ ভগিনি, তোমরা দেখিতেছ এই ধর্ম্মশাস্ত্রগুলি পুরুষরচিত বিধি ব্যবস্থা ভিন্ন আর কিছুই নহে। মুনিদের বিধানে যে কথা শুনিতে পাও, কোন স্ত্রী মুনির বিধানে হয়ত তাহার বিপরীত নিয়ম দেখিতে পাইতে। ধর্ম্মগ্রন্থসমূহ ঈশ্বরপ্রেরিত বা ঈশ্বরাদিষ্ট নহে। যদি ঈশ্বর কোন দূত রমণীশাসনের নিমিত্ত প্রেরণ করিতেন, তবে সে দূত কেবল এসিয়ায় সীমাবদ্ধ থাকিতেন না। দূতগণ ইউরোপে যান নাই কেন? আমেরিকা এবং সুমেরু হইতে কুমেরু পর্য্যন্ত যাইয়া "রমণীজাতিকে নরের অধীন থাকিতে হইবে" ঈশ্বরের এই আদেশ শুনান নাই কেন? ঈশ্বর কি কেবল এসিয়ারই ঈশ্বর? আমেরিকার কি তাঁহার রাজত্ব ছিল না? ঈশ্বরদত্ত জল বায়ু ত সকল দেশেই আছে—কেবল দূতগণ সর্ব্বদেশময় ব্যাপ্ত হন নাই কেন? যে কথা পুরাকালে অসভ্য বর্ব্বরগণ বিশ্বাস করিয়াছিল, তাহা বর্ত্তমান কালের সুসভ্যগণ যদি বিশ্বাস করেন, তবে সভ্যতায় ও অসভ্যতায় প্রভেদ কি? যাহা হউক এখন আমরা আর ধর্ম্মের নামে নতমস্তকে নরের প্রভুত্ব সহিব না। আরও দেখ যেখানে ধর্ম্মের বন্ধন অতিশয় দৃঢ়, সেইখানে নারীর প্রতি অত্যাচার অধিক। প্রমাণ—সতীদাহ। যেখানে ধর্ম্মবন্ধন শিথিল, সেখানে রমণী অপেক্ষাকৃত স্বাধীনা অর্থাৎ পুরুষের সমতুল্যা। এস্থলে ধর্ম্ম অর্থে ধর্ম্মের সামাজিক বিধান বুঝাইতেছে।

ভগিনি, তোমরা দেখিতেছ **এই ধর্ম্মশাস্ত্রগুলি পুরুষরচিত বিধি ব্যবস্থা ভিন্ন আর কিছুই নহে**। মুনিদের বিধানে যে কথা শুনিতে পাও, কোন স্ত্রী মুনির বিধানে হয়তো তাহার বিপরীত নিয়ম দেখিতে পাইতে। **ধর্ম্মগ্রন্থসমূহ ঈশ্বরপ্রেরিত বা ঈশ্বরদিষ্ট নহে।** যদি **ঈশ্বর কোন দূত রমণীশাসনের নিমিত্ত প্রেরণ করিতেন, তবে সে দূত কেবল এসিয়ায় সীমাবদ্ধ থাকিতেন না।** দূতগণ ইউরোপে যান নাই কেন? আমেরিকা এবং সুমেরু হইতে কুমেরু পর্যন্ত যাইয়া "রমণীজাতিকে নরের অধীন থাকিতে হইবে" ঈশ্বরের এই আদেশ শুনান নাই কেন? ঈশ্বর কি কেবল এসিয়ারই ঈশ্বর? আমেরিকার কি তাঁহার রাজত্ব ছিল না? ঈশ্বরদত্ত জল বায়ু ত সকল দেশেই আছে—কেবল দূতগণ সর্ব্বদেশময় ব্যাপ্ত হন নাই কেন? **যে কথা পুরাকালে অসভ্য বর্বরগণ বিশ্বাস করিয়াছিল, তাহা বর্ত্তমান কালের সুসভ্যগণ যদি বিশ্বাস করেন, তবে সভ্যতায় ও অসভ্যতায় প্রভেদ কি? যাহা হউক এখন আমরা আর ধর্ম্মের নামে নতমস্তকে নরের প্রভুত্ব সহিব না**। আরও দেখ **যেখানে ধর্ম্মের বন্ধন অতিশয় দৃঢ়, সেইখানে নারীর প্রতি অত্যাচার অধিক**...**যেখানে ধর্ম্মবন্ধন শিথিল, সেখানে রমণী অপেক্ষাকৃত স্বাধীনা অর্থাৎ পুরুষের সমতুল্যা**।

এই পুরো অনুচ্ছেদটাই আস্ত একটা অ্যাটম বোমার মতো। ঈমানের উপর পড়লেই কিচ্ছা খতম। অল্প কয়েকটা বাক্যে রোকেয়া কি নিপুণভাবেই না ইসলামকে একাধিকবার মিথ্যা সাব্যস্ত করার অপচেষ্টা করেছেন।

রোকেয়া এখানে ইসলাম, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান ও সনাতন—এই চারটি প্রধান ধর্মকেই কটাক্ষ করেছেন (যেহেতু এই চার ধর্মের প্রধান পয়গম্বররাই এশিয়াতে আগমন করেছেন)। আর একই সাথে **তিনি "ঐশী দূত" অর্থাৎ রাসূল সাঃ সহ পূর্বের সকল নবী-রাসূলদেরও ভণ্ড বলেছেন**। এর ফলে শুধু কুরআনই নয়, বরং কুরআনের আগে নাযিলকৃত তাওরাত, যাবুর, ইঞ্জিলসহ সকল আসমানি কিতাবকেই তিনি বানোয়াট হিসেবে দাবি করেন।

পূর্ববর্তী সকল নবী ও রাসূলদের ভণ্ড বলার পিছনে তার যুক্তি, মহান আল্লাহ তাআলা যদি সত্যিই নবী-রাসূল পৃথিবীতে পাঠাতেন, তাহলে তারা কেবল এশিয়াতে সীমাবদ্ধ থাকতো না।

অথচ এটি সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা[৯]। মহান আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক জাতির কাছেই নবী-রাসূল প্রেরণ করা করেছেন। কুরআনে সকল জাতিগোষ্ঠীর সব নবী-রাসূলদের উল্লেখ করা হয়নি, বরং কুরাইশদের পরিচিত রাসূলদের ঘটনাই শুধু বলা হয়েছে। তার মানে এই না যে, পৃথিবীর বাকি ভূখণ্ডগুলোতে কোন নবীই প্রেরিত হয়নি। আল্লাহ তাআলা নিজেই পবিত্র কুরআনে বলেন,

“প্রত্যেক জাতির কাছে আমি রসূল পাঠিয়েছি (এ সংবাদ দিয়ে) যে, আল্লাহর ‘ইবাদাত কর আর তাগুতকে বর্জন কর। অতঃপর আল্লাহ তাদের মধ্যে কতককে সৎপথ দেখিয়েছেন, আর কতকের উপর অবধারিত হয়েছে গুমরাহী, অতএব যমীনে ভ্রমণ করে দেখ, সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের পরিণতি কী ঘটেছিল!”

(সূরা আন-নাহ্ল ১৬:৩৬)

“প্রত্যেক জাতির জন্য (পাঠানো হয়েছে) একজন রসূল। তাদের রসূল যখন এসেছে তখন ন্যায়পরায়ণতার সঙ্গে তাদের মাঝে ফায়সালা করা হয়েছে। তাদের প্রতি কোন যুলম করা হয়নি।”

(সূরা ইউনুস ১০:৪৭)

রোকেয়ার আরেকটি দাবি, পয়গম্বর বা নবী-রাসূলরা যদি নারী হতেন, তাহলে ধর্মীয় বিধি-বিধান এখনকার চাইতে ভিন্ন হতো।

---

[৯] আরও বিস্তারিত ও সুস্পষ্টভাবে জানতে পড়ুন, ‘ডাবল স্ট্যান্ডার্ড ৩’ বইয়ের প্রথম অধ্যায় ‘শুধু মিডল ইস্টের কাহিনী কেন?’

এটাও সুস্পষ্ট মিথ্যাচার। নবী-রাসূলগণ ও আল্লাহ্র বিধানের অবমাননা। নবী-রাসূলগণ নিজেদের ইচ্ছায় নবুয়ত ও রিসালাতের দাবি করতে পারতেন না। আল্লাহই নিজের ইচ্ছেমতো পৃথিবীতে তার মনোনীত বান্দাদের নবী ও রাসূল হিসেবে প্রেরণ করতেন। আর, পৃথিবীতে শুধু পুরুষরাই নবী-রাসূল হবে, এটা আল্লাহরই সিদ্ধান্ত। কারণ, আল্লাহ্র বিধি-বিধান প্রচার করতে গিয়ে যেসব বাঁধা-বিপত্তির মুখোমুখি হতে হতো, নারীরা সেসব বাঁধা সহ্য করার উপযুক্ত নন। আল্লাহ্ তাআলা তাদের সেভাবে সৃষ্টি করেননি। তাই নবুওয়াত ও নেতৃত্ব সবসময়ই পুরুষদের জন্য বরাদ্ধ। এটি যতটা না অধিকার, তার চাইতেও বেশি দায়িত্ব। অথচ এই সহজ ব্যাপারটা বুঝতে না পেরে রোকেয়া নবুওয়াতেও সমঅধিকারের কচকচানি চালিয়েছেন।

রাসূল সাঃ কিংবা তাঁর পূর্ববর্তী কোন নবী কিংবা রাসূলই নিজেদের ইচ্ছেমতো আইন তৈরি করতে পারতেন না। আল্লাহ্ তাদেরকে যেভাবে বলতেন, তারা আল্লাহর নির্দেশনা অনুযায়ী সেভাবেই মানুষের জন্য ইসলামের বিধি-বিধান ব্যাখ্যা করতেন। এ ব্যাপারে তাদের নিজস্ব কোন স্বাধীনতা ছিল না।

এর অন্যতম প্রমাণ হল, আমাদের রাসূল সাঃ ছিলেন উম্মী নবী। যিনি লিখতে পড়তে পারতেন না। তারপরও তিনি এমন এক কিতাবকে মানুষের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন, যা কোন মানুষের লেখা হতে পারে না। যারা কুরআনকে মানুষের রচনা বলে অপপ্রচার চালায়, তাদেরকে আল্লাহ্ সরাসরি কুরআনে চ্যালেঞ্জ দিয়েছেন[১০], যে চ্যালেঞ্জে আজ পর্যন্ত কোন কাফির, মুশরিক সফলতা পায়নি, ভবিষ্যতেও পাবে না। আল্লাহ্ তাআলা বলেন,

---

[১০] শুধু এই চ্যালেঞ্জই নয়। আল্লাহ্ কুরআনে কাফিরদের প্রতি ধারাবাহিক চ্যালেঞ্জ দেন। আল্লাহ্ বলেন,

“বল, ‘এ কুরআনের মত একখানা কুরআন আনার জন্য যদি সমগ্র মানব আর জ্বীন একত্রিত হয় তবুও তারা তার মত আনতে পারবে না, যদিও তারা পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য ও সহযোগিতা করে।’”

(সূরা বনি ইসরাইল ১৭:৮৮)

“আমি আমার বান্দাহর প্রতি যা নাযিল করেছি তাতে তোমাদের কোন সন্দেহ থাকলে তোমরা তার মত কোন সূরাহ্ এনে দাও আর তোমরা যদি সত্যবাদী হও, তবে আল্লাহ ছাড়া তোমাদের সকল সাহায্যকারীকে আহবান কর। যদি তোমরা না পার এবং কক্ষনো পারবেও না, তাহলে সেই আগুনকে ভয় কর, যার ইন্ধন হবে মানুষ এবং পাথর, যা প্রস্তুত রয়েছে কাফেরদের জন্য।”

(সূরা বাকারা ০২:২৩-২৪)

বেগম রোকেয়ার আরও মন্তব্য করেন, **নবী-রাসূলদের উপর প্রেরিত আসমানি কিতাব ও বিধানকে তৎকালীন অসভ্যরা (অর্থাৎ প্রত্যেক নবী ও রাসূলদের স্ব**

কাফিররা এই চ্যালেঞ্জের মুকাবিলা করতে না পারায় আল্লাহ্ তাআলা আরেকটু সহজ করে বললেন,

“তারা কি বলে ‘সে [অর্থাৎ মুহাম্মাদ (সা.)] ওটা রচনা করেছে?’ বল, ‘তাহলে তোমরা এর মত দশটি সূরাহ রচনা করে আনো, আর (এ কাজে সাহায্য করার জন্য) আল্লাহকে বাদ দিয়ে যাকে ডাকতে পার ডেকে নাও যদি তোমরা সত্যবাদী হয়েই থাক।”

(সূরা হুদ ১১:১৩)

মজার ব্যাপার হল, আরবের কাফির-মুশরিকরা এই চ্যালেঞ্জের মুকাবিলাও করতে পারেনি। তারপর আল্লাহ্ তাআলা আরও একটু সহজ করে বলেন,

“তারা কি এ কথা বলে যে, সে [অর্থাৎ মুহাম্মাদ (সা.)] এটা রচনা করেছে? বল, তাহলে তোমরাও এর মত একটা সূরাহ্ (রচনা করে) নিয়ে এসো আর আল্লাহকে বাদ দিয়ে যাকে পার তাকে ডেকে নাও যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাক [যে মুহাম্মাদ (সাঃ)-ই তা রচনা করেছেন]।”

(সূরা ইউনুস ১০:৩৮)

অনুমিতভাবেই, এই চ্যালেঞ্জও কোন কাফির গ্রহণ করেনি। অথচ কুরাইশ, ইহুদীদের মাঝে আরবি ভাষা, কবিতা ও সাহিত্যে দক্ষ অসংখ্য ব্যাক্তি ছিল। আজো লক্ষ লক্ষ ইসলামবিদ্বেষী আরবি ভাষায় সুগভীর পাণ্ডিত্য রাখেন। তবুও, গত চৌদ্দশো বছরে একজন মানুষও এই চ্যালেঞ্জে সফল হতে পারেনি। কেয়ামত পর্যন্ত চেষ্টা করেও যে তারা সফল হতে পারবেনা, সেটা সুনিশ্চিত। অথচ এই মিথ্যাবাদীরা বলেন, কুরআন নাকি অক্ষরজ্ঞানহীন রাসূল সাঃ বানিয়ে বানিয়ে লিখেছেন। কাফিররা কতই না নিচ আর অসৎ।

স্ব সাহাবীগণ) মেনে নিয়েছেন[১১]। অর্থাৎ, প্রত্যেক নবী ও রাসূলগণের সম্মানিত সাহাবী-অনুসারীদেরকে অসভ্য বলে অপমান করেছেন রোকেয়া।

তার মতে, আধুনিক সময়ে এসে (ইউরোপিয়ান) সভ্যতার ছোঁয়া পাওয়া মানুষেরা সেসব বিশ্বাস করলে সভ্যতা আর অসভ্যতার পার্থক্য কোথায়?

এখানেই শেষ না। তিনি ইঙ্গিতপূর্ণ দাবি করে বলেন, যেখানেই ধর্মের বন্ধন দৃঢ় (মুসলিমপ্রধান অঞ্চল), সেখানেই নারীদের প্রতি নির্যাতন বেশী হয়। আর যে অঞ্চলে ধর্মবন্ধন শিথিল (ইউরোপ-আমেরিকার প্রতি ইঙ্গিত করে বলেছেন) সেখানে নারীরা ধর্মীয় অঞ্চল থেকে স্বাধীন।

ছয়

২০ শিশুকে মাতা বলপূর্ব্বক ঘুম পাড়াইতে বসিলে, ঘুম না পাওয়ায় শিশু যখন মাথা তুলিয়া ইতস্ততঃ দেখে, তখনই মাতা বলেন "ঘুমা শিগ্‌গির ঘুমা ! ঐ দেখ জুজু !" ঘুম না পাইলেও শিশু অন্ততঃ চোখ বুঝিয়া পড়িয়া থাকে। সেই রূপ আমরা যখনই উন্নত মস্তকে অতীত ও বর্ত্তমানের প্রতি দৃষ্টিপাত করি, অমনই সমাজ বলে "ঘুমাও, ঘুমাও, ঐ দেখ নরক !" মনে বিশ্বাস না হইলেও অন্ততঃ মুখে কিছু না বলিয়া আমরা নীরব থাকি। (ক্রমশঃ)

'শিশুকে মাতা বলপূর্বক ঘুম পাড়াইতে বসিলে, ঘুম না পাওয়ায় শিশু যখন মাথা তুলিয়া ইতস্ততঃ দেখে, তখনই মাতা বলেন, "ঘুমা শিগগির ঘুমা! ঐ দেখ

---

[১১] এখানে যেন কেউ এই ভুল সিদ্ধান্তে না আসেন যে, বেগম রোকেয়া বলতে চেয়েছেন, ইসলাম গ্রহণের আগে তারা অসভ্য, বর্বর ছিল। বরং তিনি বলেছেন, অসভ্য, বর্বর ছিল বলেই তারা সকল নবী-রাসূলদের দ্বীনের দাওয়াত গ্রহণ করেছেন। সভ্য, আধুনিক হলে তারা নারী নির্যাতনকারী এসকল কথা বিশ্বাস করার মতো 'ভুল' করতো না।

জুজু!” ঘুম না পাইলেও শিশু অন্ততঃ চোখ বুঝিয়া পড়িয়া থাকে। সেই রূপ আমরা যখন উন্নত মস্তকে অতীত ও বর্তমানের প্রতি দৃষ্টিপাত করি, অমনই সমাজ বলে, “ঘুমাও ঘুমাও ঐ দেখ নরক!” মনে বিশ্বাস না হইলেও অন্তত আমরা মুখে কিছু না বলিয়া নীরব থাকি।’

‘**অলঙ্কার না badge of slavery**’ প্রবন্ধের আরেকটি অনুচ্ছেদের দিকে লক্ষ্য করুন। বেগম রোকেয়া নরক তথা জাহান্নামের ব্যাপারেও তার বিশ্বাস স্পষ্ট করে দিয়েছেন এখানে। তার মতে, ধর্মই যেহেতু নারীদেরকে মাথা উঁচু করে দাড়াতে বাঁধা দেয়, তাই ধর্মের বলা ‘নরক’-এর গল্পও তিনি বিশ্বাস না করলেও কিছু বলেন না। বাচ্চাদের জুজুবুড়ির ঘুম পাড়ানি গল্পের মত ‘নরক’-এর গল্পও যেন কাল্পনিক কিচ্ছা-কাহিনী।

জান্নাত, জাহান্নাম, হাশর—অর্থাৎ আখিরাত ইসলামের মৌলিক রূকনের অন্তর্ভুক্ত, যার উপর বিশ্বাস করা ঈমানের অন্যতম শর্ত। কেউ এই তিনটির অস্তিত্বের যে কোন একটিকে অস্বীকার করার অর্থ, সে ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে গেছে। বেগম রোকেয়ার মত যারাই রাসূল সাঃ-কে অস্বীকার করে, রাসূলগণকে মিথ্যাবাদী, ভণ্ড বলে অপবাদ দেয়, সর্বোপরি আল্লাহর দেয়া নিদর্শনকে অস্বীকার করে, তাদের উদ্দেশ্যে আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

আর যারা কুফরী করবে ও আমার নিদর্শনগুলোকে অস্বীকার করবে, তারাই জাহান্নামী; সেখানে তারা চিরকাল থাকবে।

(সূরা বাকারা ০২:৩৯)

সাত

কেহ বলিতে পারেন যে, "তুমি সামাজিক কথা বলিতে গিয়া ধর্ম্ম লইয়া টানাটানি কর কেন?" তদুত্তরে বলিতে হইবে যে, "ধর্ম্ম"ই আমাদের দাসত্ববন্ধন দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর

৬১২ রোকেয়া রচনাবলী

করিয়াছে ; "ধর্ম্মের" দোহাই দিয়া পুরুষ রমণীর উপর প্রভুত্ব করিতেছেন। তাই "ধর্ম্ম" লইয়া টানাটানি করিতে বাধ্য হইলাম। এজন্য ধার্ম্মিকগণ আমায় ক্ষমা করিতে পারেন !

"কেহ বলিতে পারেন যে, 'তুমি সামাজিক কথা বলিতে গিয়া ধর্ম্ম লইয়া টানাটানি কর কেন?' তদুত্তরে বলিতে হইবে যে, 'ধর্ম্ম'ই আমাদের দাসত্ববন্ধন দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর করিয়াছে; 'ধর্ম্মের' দোহাই দিয়া পুরুষ রমণীর উপর প্রভুত্ব করিতেছেন। তাই 'ধর্ম্ম' লইয়া টানাটানি করিতে বাধ্য হইলাম। এজন্য ধার্ম্মিকগণ আমায় ক্ষমা করিতে পারেন!"

অর্থাৎ, ইসলাম, সনাতন কিংবা যে কোন ধর্ম—সবই নারীদেরকে ধর্মের নামে দাস করে রেখেছে। তাই, ধর্মের শিকল থেকে নিজেকে মুক্তি ব্যতীত নারীজাতির মুক্তির আর কোন পথ নেই।

প্রিয় বোন, এই হলো বেগম রোকেয়ার ইসলাম, রাসূলগণ, আসমানি কিতাবসমূহ, সাহাবীদের ব্যাপারে বিশ্বাস। এসব পড়ার পর বেগম রোকেয়ার ঈমান সম্পর্কে আপনাকে আর কিছু কি ব্যাখ্যা করতে হবে?

রোকেয়া তার এই প্রবন্ধটিই পরে পরিমার্জন করে ***'আমাদের অবনতি'*** নামে মাসিক **'নবনূর'** পত্রিকায় ১৩১১ বঙ্গাব্দের ভাদ্রে (সেপ্টেম্বর ১৯০৪) প্রকাশ করেন। প্রায় দেড় বছর পর প্রকাশিত এই প্রবন্ধেও বেগম রোকেয়া নবী-রাসূল

ও আসমানি কিতাবসমূহ নিয়ে একইরকম অবমাননাকর মন্তব্য করেন। পরবর্তীতে মুসলিমদের সমালোচনার মুখে পড়লে তিনি শুধু চরম অবমাননাকর কথাগুলো কৌশলে মুছে দিয়ে ঈমান বিধ্বংসী প্রবন্ধটি ***‘স্ত্রীজাতির অবনতি’*** নামে *মতিচূর* প্রথম খণ্ডে প্রকাশ করেন।

রোকেয়া এখানে বেশ কয়েকভাবে ইসলামকে কটাক্ষ করেছেন—

❑ রাসূল সাঃ-কে মিথ্যুক, ভণ্ড ও স্বেচ্ছাচারী দাবি।

❑ ঈসা আঃ-কেও একইভাবে সুচতুর মিথ্যুক দাবি।

❑ সর্বোপরি, সকল নবী ও রাসূলদের ভণ্ড ও মিথ্যুক দাবি।

❑ কুরআনসহ সকল আসমানি কিতাবকে, আল্লাহর বিধানসমূহকে মিথ্যা দাবি।

❑ রাসূল সাঃ সহ সকল নবী এর সাহাবীদেরকে অসভ্য, বর্বর, বুদ্ধিহীন, মূর্খ বলে কটূক্তি।

❑ আদম আঃ ও হাওয়া আঃ সম্পর্কে কুরআনের স্পষ্ট ঘোষণার ব্যাপারে সন্দেহ প্রকাশ।

শুধু ‘**অলংকার না badge of slavery**’ই নয়, মাসিক ‘নবনূর’ পত্রিকায় ১৩১১ বঙ্গাব্দের আশ্বিনে (অক্টোবর ১৯০৪) বেগম রোকেয়া **‘অর্ধাঙ্গী’** নামে একটি প্রবন্ধ লিখেন। সেখানে তিনি বলেন,

“মুসলমানের মতে আমরা পুরুষের “অর্দ্ধেক”, অর্থাৎ দুইজন নারী একজন নরের সমতুল্যা।...আপনারা “মুহম্মদীয় আইনে” দেখিতে পাইবেন যে বিধান আছে, পৈতৃক সম্পত্তিতে কন্যা পুত্রের অর্দ্ধেক ভাগ পাইবে।...[কিন্তু] আমরা ঈশ্বর ও মাতার নিকট ভ্রাতাদের “অর্দ্ধেক” নই। তাহা হইলে এইরূপ স্বাভাবিক বন্দোবস্ত হইত—পুত্র যেখানে দশ মাস স্থান পাইবে, দুহিতা সেখানে পাঁচ মাস!!...আমরা জননীর স্নেহ মমতা ভ্রাতার সমানই ভোগ করি। মাতৃহৃদয়ে পক্ষপাতিতা নাই।”

বেগম রোকেয়া রাসূল সাঃ-এর বিরুদ্ধে যে অভিযোগ তুলেছেন, কুরআন এ ব্যাপারে কি বলে শুনুন। আল্লাহ্ তাআলা বলেন,

“আল্লাহ্ তোমাদেরকে তোমাদের সন্তান-সন্ততির (অংশ) সম্পর্কে নির্দেশ দিচ্ছেন, **পুরুষ দুই নারীর অংশের সমান পাবে**, তবে সন্তান-সন্ততি যদি শুধু দু’জন নারীর অধিক হয় তাহলে তাঁরা রেখে যাওয়া সম্পত্তির তিন ভাগের দু’ ভাগ পাবে, আর কেবল একটি কন্যা থাকলে সে অর্ধেক পাবে এবং তার পিতা-মাতা উভয়ের প্রত্যেকে রেখে যাওয়া সম্পত্তির ছয় ভাগের এক ভাগ পাবে যদি তার সন্তান থাকে, আর যদি তার সন্তান না থাকে এবং তার ওয়ারিশ মাতা-পিতাই হয়, সে অবস্থায় তার মাতার জন্য এক তৃতীয়াংশ, কিন্তু তার ভাই-বোন থাকলে, তার মাতা পাবে ছয় ভাগের এক ভাগ, (ঐসব বণ্টন হবে) তার কৃত ওয়াসীয়াত অথবা ঋণ পরিশোধের পর। তোমরা জান না তোমাদের পিতা এবং সন্তানদের মধ্যে কে তোমাদের পক্ষে উপকারের দিক দিয়ে অধিকতর নিকটবর্তী। (এ বণ্টন) আল্লাহর পক্ষ হতে নির্ধারিত করে দেয়া হয়েছে, নিশ্চয় আল্লাহ্ মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাশীল।”

(সূরা আন-নিসাঃ ০৪:১১)

প্রিয় বোন, লাইনগুলো ভালো করে খেয়াল করুন। এই আয়াতে সুস্পষ্টভাবে সম্পত্তি বণ্টনের নীতিমালা বলে দেওয়া হয়েছে। আল্লাহর এই বিধানকে বেগম রোকেয়া “মুহম্মদীয় আইন” বলে কটাক্ষ করেছেন।

একটি পরিবারের কথা ভাবুন, যেখানে এক ভাই ও দুই বোন রয়েছে। আল্লাহ তাআলা যেহেতু নারীদের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব তার মাহরাম আত্মীয়দের উপর ন্যস্ত করেছেন, তাই পিতার মৃত্যুর পর সম্পত্তির ক্ষেত্রে নারীরা স্বাভাবিক ভাবেই অর্ধেক পান। কারণ, নারীদের উপর কারো আর্থিক দায়িত্ব গ্রহণের[১২] বাধ্যবাধকতা নেই। পিতার সম্পত্তি থেকে বোনেরা যেটুকু পাবেন, ইসলামী শরিয়াহ অনুযায়ী সেটুকু তারা কারো জন্যই খরচ করতে বাধ্য না।

---

[১২] এমনকি নারীদের পিতা-মাতার আর্থিক দায়িত্বও তাদের উপর দেয়া যাবে না।

অপরদিকে তাদের ভাইয়ের কথা ভাবুন। সে হয়তো বোন থেকে দ্বিগুণ সম্পত্তি পাবে। কিন্তু তার মা, অবিবাহিত বোন, সন্তান-সন্ততি এবং পরিবারের বাকি সকল সদস্যদের আর্থিক দায়িত্ব সেই পুরুষটার একার[১৩]। তাহলে এখানে প্রকৃতপক্ষে কে 'বেশী' পেলো?

এভাবেই রোকেয়া সম্পত্তির সঙ্গে ভালোবাসার অসম বালখিল্য তুলনা দিয়ে রাসূল সাঃ-কে পরোক্ষভাবে পুরুষদের পক্ষপাতী ও নারীদের উপর অত্যাচারকারী বলে খোঁটা দেন।

মাত্র ২৩/২৪ বছর বয়সে বেগম রোকেয়া এই কথাগুলো অবলীলায় লিখে তৎকালীন ইংরেজি শিক্ষিত মুসলমানদের পত্রিকায় প্রচার করেন। এভাবেই ভারতীয় উপমহাদেশের মুসলিমদের মাঝে ছড়িয়ে পড়ে ভয়াবহ এক রোগ, জাহান্নাম ছাড়া যার আর কোন নিরাময় নেই। ইসলামের পরিভাষায় তাকে বলা হয়—**ইরতিদাদ/ধর্মত্যাগ**।

---

[১৩] এ ব্যাপারে বিস্তারিত জানতে পড়ুন 'ডাবল স্ট্যান্ডার্ড ৩' বইয়ের 'অর্ধেক কেন? উত্তরাধিকার ও সাক্ষ্যে' অধ্যায়টি।

“পর্দা” হত্যা

প্রিয় বোন। মুসলিম নারী জাতির ‘উদ্ধারে’ বেগম রোকেয়ার গুণগান তো অনেক পড়েছেন। অথচ, আমাদের ভালোবাসার, শ্রদ্ধার নবী-রাসূলগণ আর আসমানী কিতাব অর্থাৎ ওহি সম্পর্কে তার বিশ্বাস কেমন ছিল, তা তো দেখতেই পেলেন। একটু ভেবে দেখুন তো, যে মানুষটা নিজেই জাহান্নামের পথে পাগলের মত ছুটছে, সে আবার কীভাবে মুসলিম নারীদের উদ্ধার করবে? আর ‘কার’ হাত থেকেই বা উদ্ধার করবে?

চলুন, তার আরও কিছু অজানা তথ্য জেনে আসি। এগুলো এমন সব তথ্য, যা আপনি স্কুল কলেজের বইতে কখনো পাবেন না।

বেগম রোকেয়া যে দুটি কাজ সারাজীবন নিষ্ঠার সাথে করেছেন, তার একটি হল নারীদের জন্য পুরুষদের সমান অধিকার দাবি (তা সে ধর্মীয় কিংবা ধর্মবিরোধী, যুক্তিযুক্ত বা অযৌক্তিক—যাই হোক)। আর অপরটি হল, **নারীদেরকে ইসলাম নির্ধারিত ‘পর্দা ব্যবস্থা’র বাইরে যে কোন মূল্যে বের করে আনা**। কারণ, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাঃ যিনা ব্যাভিচারকে সমূলে দমন করতে নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশাকে সীমাবদ্ধ করে পর্দার বিধান প্রতিষ্ঠা করেছেন। আর, সেইসব বিধানকে গোঁড়া থেকে উপড়ে না ফেললে নারীরা ঘরের দায়িত্ব রেখে সবক্ষেত্রে পুরুষদের ‘সমান’ হওয়ার অযৌক্তিক প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে পারবে না। তাই, স্বীয় এই লক্ষ্যে পৌছাতে তিনি তার গোটা জীবনটাই উৎসর্গ করে দেন। পদে পদে কটূক্তি, নিন্দা, অবাস্তব সমালোচনা করেন ইসলামের পর্দাপ্রথা নিয়ে।

আপনি হয়তো ভাবছেন, এই লোকটা কিসব অদ্ভুত কথা বলছে। না বোন, আমি বানিয়ে কিছু বলছি না। বেগম রোকেয়া পর্দাপ্রথা নিয়ে যা যা বলেছেন, সেগুলো তার নিজের মুখেই শুনুন না। তাহলে আপনি নিজেই বুঝতে

পারবেন, ইসলামের মৌলিক এক বিশ্বাস, রোকেয়ার অন্তরে ‘পর্দাব্যবস্থা’ সম্পর্কে কতটা ঘৃণা ছিল।

শুরুটা হয় সেই ‘**অলঃকার না badge of slavery**’তেই। সেখানে তিনি বলেন,

> “প্রথমে জাগিয়া উঠা সহজ নহে, জানি; সমাজ মহাগোলমাল বাধাইবে, জানি; মুসলমান আমাদের জন্য “কৎল” (অর্থাৎ প্রাণদণ্ড) এর বিধান দিবেন, এবং হিন্দু চিতানল বা তুষানলের ব্যবস্থা দিবেন, জানি। কিন্তু জাগিতে হইবেই! বলিয়াছি ত কোন ভাল কাজ অনায়াসে করা যায় না। কারামুক্ত হইয়াও Galileu বলিয়াছিলেন, “but nevertheless it (Earth) does move”!! আমাদিগকে ঐরূপ বিবিধ নির্যাতন সহ্য করিয়া জাগিতে হইবে। এ স্থলে পার্সী নারীদের একটী উদাহরণ দিতেছি। নিম্নলিখিত প্যারাটী এক খণ্ড উর্দু সংবাদপত্র হইতে অনুবাদিত হইল :——

> “এই পঞ্চাশ বর্ষের মধ্যে পার্সীলেডীদের অনেক পরিবর্তন হইয়াছে। **বিলাতী সভ্যতা** যাহা, **তাঁহারা এখন লাভ করিয়াছেন**, পূর্ব্বে ইহার নামমাত্র জানিতেন না। **মুসলমানদের ন্যায় তাঁহারাও পর্দ্দায় অর্থাৎ অন্তঃপুরে অবরুদ্ধা থাকিতেন**। রৌদ্র ও বৃষ্টি হইতে রক্ষা পাইবার নিমিত্ত তাঁহারা ছত্র ব্যবহারে অধীকারিণী ছিলেন না[১৪]। প্রখর রবির উত্তাপ সহিতে না পারিলে জুতাই ছত্ররূপে ব্যবহার করিতেন !! গাড়ীর ভিতর বসিলেও তাহাতে পর্দ্দা থাকিত। অন্যের সম্মুখে স্বামীর সহিত আলাপ করিতে পাইতেন না[১৫]। **কিন্তু আজি কালি পার্সী লেডীগণ পর্দ্দা ছাড়িয়াছেন**; খোলাগাড়ীতে বেড়াইয়া থাকেন; **অন্যান্য**

[১৪] নারীরা ছাতা ব্যবহার করতে পারবে না, এটা ইসলামের পর্দাব্যবস্থার কোন বিধান নয়। এগুলো হাস্যকর কুসংস্কার।

[১৫] এটাও ইসলামের পর্দাব্যবস্থার কোন বিধান নয়। স্ত্রী তার স্বামীর সঙ্গে কথা বলতে পারবে না, তাহলে কি পরপুরুষের সঙ্গে কথা বলবে?!

পুরুষের সহিত আলাপ করেন[১৬]। নিজেরা ব্যবসায় (দোকানদারী) করেন। প্রথমে যখন কতিপয় ভদ্রলোক তাঁহাদের স্ত্রীকে (পর্দ্দার) বাহির করিয়াছিলেন, তখন চারি দিকে ভীষণ কলরব উঠিয়াছিল। ধবলকেশ বুদ্ধিমানেরা বলিয়াছিলেন, "পৃথিবীর ধ্বংসকাল উপস্থিত হইল !"

কই, পৃথিবীরত ধ্বংস হয় নাই। তাই বলি, একবার একই সঙ্গে সকলে স্বাধীনতার পথে অগ্রসর হও— সময়ে সবই সহিয়া যাইবে। স্বাধীনতা অর্থে পুরুষের Equality বুঝিতে হইবে।"[১৭]

ইরানী নারীদের জেগে উঠার উদাহরণ দিতে গিয়ে বেগম রোকেয়া বলেন, 'বিলাতি সভ্যতা'র ছোঁয়াতেই ইরানী স্বামীরা তাদের স্ত্রীদেরকে পর্দা ছেড়ে বের করেন। এভাবে পরপুরুষের সঙ্গে কথা বলার স্বাধীনতা পেয়ে ওরা 'পুরুষের সমান' হওয়ার পথে এগিয়ে গেছে। মুসলিম বাঙালি নারীরা এখনো কেন ইতস্তত করছে? তারাও পর্দা ছাড়ুক। একটা সময় পর সবাই সব কিছু মেনে নিবে।

প্রিয় বোন, উপরের এই কথাগুলো ভালো করে মনে রাখবেন। বেগম রোকেয়ার এই চিন্তাধারা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, রোকেয়া তার পুরো জীবদ্দশায় অবরোধপ্রথা বা পর্দাব্যবস্থা নিয়ে যত সমালোচনা বা কটূক্তি করেছেন, তার পিছনের প্রধান কারণ তিনি এখানে বলে দিয়েছেন। তার এতো লেখনী, এতো সামাজিক কর্মকাণ্ডের উদ্দেশ্য, নারীদের সবক্ষেত্রে পুরুষের 'সমান' করা। রোকেয়ার দাবি, পুরুষের সমান হওয়ার জন্যই নারীদের 'পর্দা'

[১৬] নারীদের জন্য নন-মাহরাম (যাদের সঙ্গে বিয়ে জায়েজ) পুরুষদের সঙ্গে কোন কারণ ছাড়া ফালতু আলাপ ইসলামে নিষিদ্ধ। অথচ, বেগম রোকেয়া গুণাহ করার এই রাস্তাকে 'নারী স্বাধীনতা' বলে দাবি করেন।

[১৭] বেগম রোকেয়া, (২০০৬). রোকেয়া রচনাবলী. বাংলা একাডেমী, পৃষ্ঠা ৬১২-৬১৩

ছাড়া উচিত, পরপুরুষদের সঙ্গে কথা বলা উচিত, গাইরে মাহরাম পুরুষদের সঙ্গে মিলেমিশে উপার্জন করা উচিত।

এই লেখার মাধ্যমে রোকেয়ার পর্দা-বিদ্বেষ প্রকাশিত হলে স্বাভাবিকভাবেই তিনি বেশ সমালোচিত হন। তাই মাঝে কিছুদিন তিনি পর্দার বিরুদ্ধে বিষোদগার বন্ধ রাখেন। এমনকি বিস্ময়কর হলেও সত্যি, ***বোরকা*** প্রবন্ধে তিনি স্বীয় স্বভাবের বিপরীতে গিয়ে পর্দার পক্ষে লেখার অসহ্য যাতনা পর্যন্ত নীরবে সহ্য করতে বাধ্য হন[১৮]!

কিন্তু, মনের রঙ কি আর চিরদিন লুকিয়ে রাখা যায়? ১৯০৫ সালে প্রকাশিত *সুলতানার স্বপ্ন*-তে রোকেয়া আবারো তার পর্দাবিদ্বেষ প্রকাশ করেন। রোকেয়া তার কল্পকাহিনীতে প্রধান চরিত্রের মুখ দিয়ে বের করলেন,

“জানেন, ভগিনী সারা! সামাজিক বিধিব্যবস্থার উপর আমাদের কোন হাত নাই। ভারতে পুরুষজাতি প্রভু,—**তাহারা সমুদয় সুখ সুবিধা ও প্রভুত্ব আপনাদের জন্য হস্তগত করিয়া ফেলিয়াছে, আর সরলা অবলাকে অন্তঃপুর রূপ পিঞ্জরে আবদ্ধ রাখিয়াছে**। **উড়িতে শিখিবার পুর্ব্বেই আমাদের ডানা কাটিয়া দেওয়া হয়**—তদ্ব্যতীত সামাজিক রীতিনীতির কত শত কঠিন শৃঙ্খল পদে পদে জড়াইয়া আছে।”

শত্রুর পদভারে মুখর এই পৃথিবীতে নিরাপত্তাহীন উড়াউড়ি যে কতটা ক্ষতিকর, তা না হয় পরে কখনো আলাপ করা যাবে। চলুন তার ‘**পদ্মরাগ**’ উপন্যাসে যাই। সেখানে তিনি নায়িকা সিদ্দিকার মাধ্যমে নিজের মনের কথাই ফুটিয়ে তুললেন,
“আমি আজীবন…নারীজাতির কল্যাণ সাধনের চেষ্টা করিব এবং অবরোধ-প্রথার মূলোচ্ছেদ করিব।”

পর্দা-ব্যবস্থা ভেঙে ফেললে নারী-জাতির জন্য গুণাহের পথ খুলে যায়। এইভাবে রোকেয়া নারী-জাতির ‘কল্যাণে’ আত্মোৎসর্গ করলেন।

---

[১৮] *বোরকা* প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য

আসুন বেগম রোকেয়ার সবচে আলোচিত বইয়ের দিকে এগোই। ‘***অবরোধ-বাসিনী***’[১৯] বইটির নাম নিশ্চয়ই শুনেছেন? হয়তো এর কিছু লেখাও আপনি পড়ে থাকবেন। আপনি হয়তো এটাও লক্ষ্য করে থাকবেন, ‘আল্লাহ কোথায়! তাকে দেখতে পাই না কেন? প্রমাণ ছাড়া আল্লাহ-খোদা মানি না’— সারাজীবন এই যিকির করা প্রত্যেক ইসলামবিদ্বেষীই বিনা বাক্যব্যায়ে ‘*অবরোধ-বাসিনী*’ বইয়ের প্রতিটি লাইন বিশ্বাস করে ফেলে। অথচ এই বইয়ের কাল্পনিক গল্পগুলোর ঐতিহাসিক কোন ভিত্তি আজ পর্যন্ত কেউ কোথাও প্রমাণ করতে পারেনি। বেগম রোকেয়া এই বইতে চরম হাস্যকর, আর অবাস্তব সব রূপকথার গল্প একসঙ্গে জোগাড় করেছেন। এক চরম হাস্যকর গল্পে রোকেয়া দাবি করেন, এক মেয়ে নাকি ছয় মাস নিজের ঘরের মধ্যর থাকার কারণে অন্ধ হয়ে গেছে। এই হাস্যকর ঘটনাগুলো যে রোকেয়ার সাহিত্যিক মনের রঙ মাখা গোপন কুঠুরিতে জন্ম নিয়েছে, তা আপনি বইটি পড়লেই বুঝে ফেলবেন।

যাক সে কথা। *অবরোধ-বাসিনী* বইতে বেগম রোকেয়া পর্দা নিয়ে চরম ঘৃণ্য কিছু মন্তব্য করেন। যেমন ধরুন,

- যিনি যত বেশী **পর্দা করিয়া** গৃহকোণে যত বেশী **পেঁচকের মত** লুকাইয়া থাকিতে পারেন, তিনিই তত বেশী শরীফ।

- ‘একবার আমি কোন একটী লেডীজ কনফারেন্স উপলক্ষে আলীগড়ে গিয়াছিলাম। সেখানে অভ্যাগতা মহিলাদের নানাবিধ বোরকা দেখিলাম। একজনের বোরকা কিছু অদ্‌ভুত ধরণের ছিল। তাঁহার সহিত আলাপ পরিচয়ের পর তাঁহার বোরকা প্রশংসা করায় তিনি বলিলেন,—“**আর বলিবেন না,—এই বোরকা লইয়া আমার যত লাঞ্ছনা হইয়াছে!**” পরে তিনি সেই সব লাঞ্ছনার বিষয় যাহা বলিলেন, তাহা এইঃ

---

[১৯] ১৯৩১ সালে প্রকাশিত

- তিনি কোন বাঙ্গালী ভদ্রলোকের বাড়ী শাদীর নিমন্ত্রণে গিয়াছিলেন। তাঁহাকে [বোরকা সহ] দেখিবামাত্র সেখানকার ছেলে-মেয়েরা ভয়ে চীৎকার করিয়া কে কোথায় পলাইবে, তাহার ঠিক নাই। আরও কয়েক ঘর বাঙ্গালী ভদ্রলোকের সহিত তাঁহার স্বামীর আলাপ ছিল, তাই তাঁহার সকলের বাড়ীই যাইতে হইত। কিন্তু যতবার যে বাড়ী গিয়াছেন, ততবারই ছেলেদের সভয় চীৎকার ও কোলাহল সৃষ্টি করিয়াছেন। [বোরকা দেখিয়া] ছেলেরা ভয়ে থরথর কাঁপিত।
- তিনি একবার কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। তাঁহারা চারি পাঁচ জনে **বোরকাসহ** খোলা মোটরে বাহির হইলে পথের ছেলেরা বলিত, "ওমা! ওগুলো কি গো?" একে অপরকে বলে "চুপ কর!-এই রাত্রিকালে ওগুলো ভূত না হয়ে যায় না।" বাতাসে **বোরকার নেকাব** একটু আধটু উড়িতে দেখিলে বলিত— "দেখরে দেখ। **ভূতগুলোর শুঁড় নড়ে**—! বাবারে! পালা রে!"
- তিনি এক সময় দার্জ্জিলিং গিয়াছিলেন। ঘুম ষ্টেশনে পৌঁছিলে দেখিলেন, সমবেত জনমণ্ডলী একটা বামন লোককে দেখিতেছে-বামনটা উচ্চতায় একটা ৭/৮ বৎসরের বালকের সমান, কিন্তু মুখটা বয়োপ্রাপ্ত যুবকের,—মুখভরা দাড়ী গোঁফ। হঠাৎ তিনি দেখিলেন, জনমণ্ডলীর কৌতূকপূর্ণ দৃষ্টি তাঁহার দিকে! দর্শকেরা সে বামন ছাড়িয়া এই বোরকাধারিণীকে দেখিতে লাগিল!
- তিনি পদব্রজে বেড়াইতে বাহির হইলে পথের কুকুরগুলো ঘেউঘেউ করিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিতে আসিত[২০]। দুই একটা পার্ব্বত্য ঘোড়া তাঁহাকে দেখিয়া ভয়ে সওয়ার শুদ্ধ লাফালাফি আরম্ভ করিত। একবার চায়ের বাগানে বেড়াইতে গিয়া দেখেন, তিন চারি বৎসরের এক বালিকা মস্ত ঢিল তুলিয়াছে, তাঁহাকে মারিতে[২১]!
- কেবল ইহাই নহে, পথের লোক রোরুদ্যমান শিশুকে চুপ করাইবার নিমিত্ত তাঁহাদের দিকে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া বলিত,**—"চুপ কর, ঐ দেখ মক্কা মদিনা যায়,—**ঐ!"-**ঘেরাটোপ জড়ানো জুজুবুড়ী,—ওরাই মক্কা মদিনা**!!"

❑ জনাব শরফদ্দীন আহমদ বি· এ· (আলীগড়) আজিমাবাদী নিম্নলিখিত ঘটনা কোন উর্দ্দু কাগজে লিখিয়াছেন। আমি তাহা অনুবাদ করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না। যথাঃ

---

[২০] তার বোরকা দেখে ভয় পেয়ে এই কাজ করতে চেয়েছে।

[২১] তাকে পর্দাসহ দেখে ভয় পেয়ে।

গত বৎসর পর্য্যন্ত আমি আলীগড়ে ছিলাম। যেহেতু সেখানকার ষ্টেশন একরূপ জাঁকজমকে ই· আই· আর· লাইনে অদ্বিতীয় বোধ হয়, সেই জন্য আমি প্রত্যহই পদব্রজে ভ্রমণের সময় **ষ্টেশনে** যাইতাম। সেখানে **অন্যান্য তামাসার মধ্যে অনেকগুলি ১৩শ শতাব্দীর বোরকা আমার দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল। আর খোদা মিথ্যা না বলান, প্রত্যেক বোরকাই কোন না কোন প্রকার কৌতুকাবহ ছিল**।

❑ সবার শেষে বেগম রোকেয়া তার জীবনের অন্যতম আফসোসটুকু দুটি লাইনে ফুটিয়ে তোলেন,

"কেন আসিলাম হায়! এ পোড়া সংসারে

কেন জন্ম লভিলাম পর্দ্দা-নশীন ঘরে!"

প্রিয় বোন। আজও তো কোটি কোটি মানুষ বোরকা পরে। এর মাঝে অধিকাংশ মা-বোনদের বোরকাই একেবারে সাদামাটা, কোন চাকচিক্য নেই। ঠিক যেমনটা বেগম রোকেয়ার সময়কার নারীরা ব্যবহার করতো। কিন্তু, কখনো কি শুনেছেন, বোরকা পরা নারীকে দেখে কোন কুকুর ভয় পেতে? কখনো দেখেছেন, বোরকা পরা নারীকে দেখে কোন বাচ্চাকে 'ভূত' বলে অক্কা পেতে? এগুলো যে কতটা কাল্পনিক আর ভিত্তিহীন বানোয়াট গল্প, সেটা আপনি একটু কল্পনা করলেই বুঝতে পারবেন। আল্লাহ তাআলা মানুষের জন্য যে বিধান ফরয করে দিয়েছেন, সেই বিধান মানলে পশু-পাখি কিংবা মানুষের ক্ষতি হবে, এই দাবি বিশ্বাসযোগ্য নয়।

কথার পিঠেও কথা আছে। শিশু, কুকুর কিংবা ঘোড়া হয়তো ভয় পায় না। তবে

যারা সাদামাটা পর্দা করে, সেইসকল মা-বোনকে দেখে কিন্তু আজও ইসলামবিদ্বেষী, মুশরিক, নামধারী মুসলিম ও অজ্ঞ-মূর্খ মুসলিমরা 'খালাম্মা', 'তাবু' ইত্যাদি বলে অপমান করে। যেমনটা রোকেয়া করেছেন।

দেখতেই পাচ্ছেন, পর্দার প্রতি বেগম রোকেয়ার কি পরিমাণ বিদ্বেষ ছিল। নিজে তো পর্দাকে 'মক্কা', 'মদিনা', 'জুজুবুড়ী', 'ভূত' বলে কটাক্ষ করেছেনই, উপরন্তু অন্যান্য অমুসলিম, নিজের দ্বীন নিয়ে লজ্জিত

মডার্নিস্টদের পর্দার ব্যাপারে কটূক্তিকেও তিনি পর্দা ত্যাগ করার প্রয়োজনীয়তা হিসেবে দেখিয়েছেন। এমনকি পর্দানসীন ঘরে কেন জন্মালেন, সেটা নিয়েও তার আফসোস ছিল।

একজন মুসলিম, তা সে যত পাপীই হোক না কেন, সে কাফির কিংবা মডার্নিস্ট মুরতাদদের ইসলামের বিধান নিয়ে এই ধরণের অবমাননাকর মন্তব্যকে প্রচার করবে, তাদের হাসিঠাট্টার কারণে পর্দা ত্যাগ করতে বলবে, তাদের মতোই পর্দাকে, পর্দানসীন নারীদের নিকৃষ্ট ভাষায় অপমান, অপদস্থ করবে—এ কথা কি বিশ্বাসযোগ্য?

রোকেয়ার অনেক গোঁড়া অনুসারী আছেন, যারা আপনাকে বলবে, রোকেয়া ইসলামী পর্দার বিরুদ্ধে কথা বলেনি। তিনি ‘কট্টর’, ‘গোঁড়া’ পর্দাপ্রথার বিরুদ্ধে কথা বলেছেন। বহুৎখুব।

বাস্তবতা হল, **যারা বেগম রোকেয়াকে ‘নারী জাগরণের অগ্রদূত’ বলে ঈমান এনেছে, তাদের ৯৯%-ই পর্দাব্যবস্থার কোন বিধান জানে না**। এরা কখনো ‘পর্দা ব্যবস্থা' নিয়ে সালফে সালেহীনদের বই পড়ে না। আচ্ছা, সালফে সালেহীন না হয় বাদ দিলাম। বর্তমান সময়ের কোন আলিমদের গবেষণাধর্মী বই যদি পড়তো, তাহলেও মানা যেতো। কিন্তু সেটাও তারা পড়ে না। পর্দা নিয়ে পড়বে কি, কোন বইয়েরই তো নাম জানে না।

অনেক মডারেট, মডার্নিস্ট নারী বা পুরুষ আছে আরও এককাঠি সরেস। তারা বলে, ‘**আলেমরা নারীদের ঘরবন্দি করে রাখতে পর্দার নামে মিথ্যা কথা বলে**’।

ওরা আসলে বলতে চায়, **সব আলিমরা মিথ্যাবাদী**। আর যারা জীবনে কাবা ঘরের দিকে ফিরে একবার হোঁচটও খায়নি; কোনদিন কুরআন, ইসলামের আকীদা, ফিকহ, তাফসীর, হাদীসের কোন কিতাবের পৃষ্ঠাও উলটে দেখেনি, তারাই পর্দার সব গোপন জ্ঞান নিয়ে বসে আছে।

সারাজীবন ইল্ম থেকে ‘একশো হাত দূরে থাকুন’ নীতি অবলম্বন করে কোনটা কঠিন পর্দা, আর কোনটা সঠিক পর্দা—সেটা তারা কীভাবে জানবে?

এদের জন্য আমার আসলেই আফসোস হয়। যারা আল্লাহর কুরআন ও রাসূল সাঃ-এর হাদিস নিয়ে আজীবন গবেষণা করে, তাদেরকেই যদি আপনি মিথ্যাবাদী বলেন, তাহলে **ইসলামের যে হুকুম-আহকাম, তা আপনি কার কাছ থেকে জানবেন? বেগম রোকেয়ার কাছ থেকে?** যে নারী রাসূল সাঃ-কে মিথ্যাবাদী বলে অপবাদ দেয়? কুরআনসহ সকল আসমানি কিতাবকে অস্বীকার করে? সাহাবীদেরকে গালি দেয়? এটা কি কখনো সম্ভব যে, যে মানুষটা রাসূল সাঃ-কে ঘৃণা করে, সে আপনাকে ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রকৃত শিক্ষা দিতে পারবে?

প্রিয় বোন, এই ভয়াবহ পথে আশা করি আপনি পা বাড়াবেন না। নয়তো, আল্লাহ না করুন, আপনি নিজের হাতেই নিজের জাহান্নামে যাবার পথ তৈরি করবেন। পর্দার বিধান সম্পর্কে জানতে হলে আপনাকে অবশ্যই অবশ্যই সাহাবীদের কাছে যেতে হবে। দেখতে হবে,

- **উম্মাহাতুল মুমিনীন আয়েশা রাঃ, জান্নাতি নারীদের সর্দার ফাতিমা রাঃ, রাসূল সাঃ-এর অন্যান্য স্ত্রী এবং সমসাময়িক নারীরা কীভাবে পর্দা করতেন**।
- **চার খলীফার সময়ে পর্দাব্যবস্থা কেমন ছিল**। তারা কিভাবে পর্দার বিধান প্রয়োগ করেছেন।
- শ্রেষ্ঠ তিন প্রজন্ম (সাহাবী, তাবীঈ, তাবে তাবীঈ) তথা **সালফে সালেহীনদের সময়ে পর্দাব্যবস্থা কেমন ছিল**।
- সর্বোপরি **পর্দার ব্যাপারে শরীয়াহ কি বলে**।

এই বিষয়গুলো আপনাকে জানতেই হবে, এর কোন বিকল্প নেই। তারা রাসূল সাঃ-কে সবচে কাছ থেকে দেখেছে। তাই, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাঃ মুমিন পুরুষ ও নারীদের কেমন পর্দাব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার হুকুম দিয়েছেন, সেটা তারাই সবচে ভালো করে জানতেন। আর নিজেদের জীবনে, তৎকালীন মুসলিম সমাজে সেভাবেই প্রয়োগ করেছেন। তাদেরকে ফেলে আপনি যখন এমন

কারো কাছ থেকে ইসলাম শিখবেন, যে নিজেই কুফরের পৃথিবীতে বিভ্রান্তের মতো ঘুরপাক খায়, তখন আপনার জন্য অপেক্ষা করবে ভয়াবহ পতন।

প্রিয় বোন। ইসলাম সম্পর্কে একটা কথা খুব ভালোভাবে মনে রাখবেন। কেউ যদি আগে থেকেই ইসলামবিরোধী কোন মতবাদে প্রভাবিত থাকে, তাহলে তার আকলে ইসলামের সবকিছু বোধগম্য না-ও হতে পারে। তাই, পর্দা নিয়ে আলিমগণ ছাড়া সাধারণ মানুষদের ভুলভাল যুক্তি প্রয়োগ করে সিদ্ধান্ত আসা খুবই ভয়ংকর একটি প্রবণতা। অথচ এই ভয়ঙ্কর গুণাহের কাজটাই প্রতিনিয়ত অনলাইনে অফলাইনে কোটি কোটি মানুষ করে আসছে।

ধরুনঃ—আমি আরবি জানি না। একটা জটিল আরবি শব্দের অর্থ জিজ্ঞেস করলে হা করে তাকিয়ে থাকি। শব্দের মূল উৎস জানা, পারিভাষিক অর্থ বোঝা—সে তো বহুদূরের কথা। ঈমান, আকিদাহ, ফিকহ সম্পর্কে আমার বিন্দুমাত্র ধারণা নেই। আমি মুহাদ্দিস নই, মুফতী নই, ফকীহ নই। আমার শিক্ষাজীবন কেটেছে স্কুল-কলেজে প্রেম পরকীয়ার গল্প-উপন্যাস পড়ে । জীবনে আলেমদের দশ হাত কাছ দিয়েও ঘেঁষে যাইনি। আলেমদের ফতওয়া কপি-পেস্ট করার যোগ্যতাও আমার নেই। অথচ কুরআন হাদিসের বঙ্গানুবাদ পড়ে, সাহাবীদের বিচ্ছিন্ন কিছু ঘটনা সংগ্রহ করে, নিজের পশ্চিমা প্রভাবিত বুদ্ধি খাটিয়ে পর্দাব্যবস্থা নিয়ে বড় বড় ফতওয়া দিয়ে ফেলছি। কি এক জগাখিচুড়ী অবস্থা।

এই ধরণের কাজ যারা করে, আর এই ধরণের মানুষদের যারা অনুসরণ করে, উভয়ই বিপদজনক পথে পা রেখেছে। ইজতিহাদ খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি দায়িত্ব। যে সে চাইলেই ইজতিহাদ করতে পারে না, যদি না তার যোগ্যতা থাকে। এ ধরণের ‘শিক্ষিত’ মূর্খদের জন্য নিজের আকল-বিবেকের উপর নির্ভর করে উল্টাপাল্টা ফতওয়া দেওয়া, ইজতিহাদ করা সম্পূর্ণ হারাম। আর এমন হারামে লিপ্ত ব্যাক্তির কাছ থেকে আপনি ইসলামের সঠিক হুকুম শিখতে চাচ্ছেন?

পর্দাব্যবস্থার বিস্তারিত আলোচনা করা আমার উদ্দেশ্য নয়। আমার সে যোগ্যতাও নেই। আমি শুধু আপনাকে পূর্ববর্তী আলেমদের কাছ থেকে শরীয়াহ

ও ইতিহাসের ক্ষুদ্র রেণু আপনার জন্য কপি পেস্ট করে দিতে পারব। বেগম রোকেয়ার ইসলামী হুকুমের প্রতি যে বিদ্বেষ, আমি শুধু আপনাকে সেটুকুই দেখাতে চেয়েছি।

আপনি যদি এর আগে কখনো পর্দা নিয়ে যুগশ্রেষ্ঠ আলিমদের বই পড়ে না থাকেন, তাহলে ইসলামবিদ্বেষী মানুষগুলো আপনাকে খুব সহজেই পর্দাব্যবস্থা সম্পর্কে বিভ্রান্ত করতে পারবে। দুর্ভাগ্যজনকভাবে, এটিই এখন সবখানে ঘটে চলেছে। আপনি দেখবেন, আপনার আশেপাশের বোন ও বান্ধবীরা পর্দাব্যবস্থা নিয়ে গভীর জ্ঞান রাখেন না। কারণ, পর্দাব্যবস্থা সম্পর্কে ভালো কোন বই তাদের পড়া হয় না। অথচ, পর্দাব্যবস্থা সম্পর্কে মৌলিক ইল্মটুকু জানা আপনার জন্য ফরয।

প্রিয় বোন, স্কুলের ইংরেজি সাবজেক্টের কথা ভাবুন তো। প্যারাগ্রাফ, লেটার, কম্পোজিশনে কয়টা মার্ক পাবার জন্য আপনি, আপনার ক্লাসমেটরা কত বই কিনে থাকেন। পাঞ্জেরি, লেকচার, গ্যালাক্সি—অমুক তমুক সমুক নামে হাজারো গাইড আপনাদের কেনা হয়। অথচ পর্দাব্যবস্থার মতো এতো জরুরী একটা ফরয হুকুম, যা আপনার সারা জীবন কাজে লাগবে, যে বিধান না মানলে হাজারো গুণাহের আশংকা, সেটি নিয়ে আমাদের বোনদের কোন পড়াশোনা নেই। নেই মানে নেই, এক্কেবারে জিরো। ব্যাপারটা কতটা হতাশাজনক, ভেবে দেখুন তো একবার।

ইসলামবিদ্বেষীরা যেন আপনাকে নারীমুক্তি আর নারীস্বাধীনতার নামে পর্দাব্যবস্থার ব্যাপারে ধোঁকা না দিতে পারে, তার জন্য আপনার উচিত বিশ্বস্ত কোন আলিমের কাছ থেকে পর্দার বিস্তারিত জেনে নেওয়া। এটুকু করতে অক্ষম হলে, পৃথিবী-শ্রেষ্ঠ আলিমদের অন্তত একটি বই হলেও পড়া। বাজারে অসংখ্য বই আছে বোনদের জন্য। আপনাকে শুধু মনের ইচ্ছেটাকে শক্ত করতে হবে। প্রতি মাসে হাজার হাজার টাকা এদিক সেদিক ফুচকা চটপটি, হাজারো রঙবেরঙের জামা কিনে খরচ করতে পারছেন। চাইলে একটা দুইটা

বইও কিনতে পারবেন। আরেকটু চাইলে আলেমদের সোহবতে থেকে পর্দার বিস্তারিত শিখতেও করতে পারবেন। প্রয়োজন শুধু একটু সদিচ্ছা।

পর্দা ব্যবস্থা নিয়ে লেখা অসংখ্য মুসলিম মনীষীর অসংখ্য বইয়ের সব হয়তো এখানে বলা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তবে, নিচের বাছাই করা কিছু বই আপনাকে পর্দাব্যবস্থা সম্পর্কে মৌলিক একটা ধারণা দিবে ইনশাআল্লাহ—

হাকীমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ.-র '**নারী ও পর্দা (কি ও কেন?)**',

ড. মুহাম্মাদ ইবনে আবদুর রহমান আরিফী হাফিযাহুল্লাহ-র '**ভার্সিটির ক্যান্টিনে**',

ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর রহ.-র '**কুরআন-সুন্নাহর আলোকে পোশাক, পর্দা ও দেহ-সজ্জা**',

শাইখুল ইসলাম ইমাম তাকিউদ্দীন ইবনে তাইমিয়া রহ.-র '**মুসলিম নারীর হিজাব ও সালাতে তার পোশাক**',

মুফতী মুহাম্মদ হাবিব ছামদানীর '**কুরআন ও বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে পর্দা**'

সহ আরও অনেক বই আপনার বুকসেলফ আলোকিত করতে পারে। প্রতিটি বইয়ের লেখকই মুসলিম উম্মাহর কাছে যেমন সম্মানিত, তেমনি বইগুলোও পৃথিবী জুড়ে লাখো মুমিনা-মুসলিমাহ বোনের ঈমানি জীবনের সঙ্গী।

আপনি যদি একটু কষ্ট করে খোঁজেন, এরকম আরও অসংখ্য বই আপনি পেয়ে যাবেন। তবে, পড়ার আগে লেখক সম্পর্কে জেনে নেওয়া উত্তম। যদি মুসলিম উম্মাহর বিশ্বস্ত আলেম হয়ে থাকে, তাহলে তার বই পড়তে পারবেন

ইনশাআল্লাহ। আমার বিশ্বাস, পর্দাব্যবস্থা সম্পর্কে জানার যত ঘাটতি রয়েছে, অতি দ্রুত সে ঘাটতি পূরণে আপনি সফল হবেন।

রোকেয়া কেন কাফির?

বেগম রোকেয়ার ঈমান ছিল কি না, তিনি মুসলিম না কাফির ছিলেন—প্রশ্নটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ইসলামবিদ্বেষীরা তার নাম ব্যবহার করে মুসলিমদের অনেক ধোঁকা দিয়েছে এবং দিয়ে যাচ্ছে। তাই, তার ব্যাপারে আমাদের সংশয় দূর করা প্রয়োজন। এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানার আগে ঈমান বলতে কি বোঝায়, চলুন সেটি জেনে নিই।

ঈমান

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা ঈমানের স্তম্ভগুলোর ব্যাপারে বলেন,

“হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহতে, তাঁর রাসূলে, তাঁর রাসূলের উপর যে কিতাব অবতীর্ণ করেছেন তাতে এবং যে কিতাব তিনি পূর্বে অবতীর্ণ করেছেন তাতে ঈমান আন। এবং কেউ আল্লাহ, তাঁর ফিরিশতাগণ, তাঁর কিতাবসমূহ, তাঁর রাসূলগণ এবং পরকালকে অবিশ্বাস করলে সে ভীষণভাবে পথভ্রষ্ট হয়ে পড়বে।”[২২]

কুরআনের বিভিন্ন স্থানে আল্লাহ তাআলা একত্রে বা আলাদাভাবে উপরের বিষয়গুলি তুলে ধরেছেন। বিভিন্ন হাদিসেও ঈমানের ৬টি রুকন উল্লিখিত হয়েছে। আবু হুরাইরা রাঃ বলেন, ঈমানের পরিচয় দিয়ে রাসূলুল্লাহ সাঃ বলেছেন,

“(ঈমান এই যে) তুমি বিশ্বাস করবে আল্লাহতে [১], তাঁর ফিরিশতাগণে [২], তাঁর কিতাবসমূহে [৩], তাঁর সাক্ষাতে, তাঁর রাসূলগণে [৪] এবং তুমি

[২২] সূরা নিসাঃ আয়াত ১৩৬

বিশ্বাস করবে শেষ পুনরুত্থানে [৫] এবং তুমি বিশ্বাস করবে তাকদীর [৬] বা নির্ধারণের সবকিছুতে।"[২৩]

এ কয়টি বিষয়ে ঈমান বা বিশ্বাস স্থাপন করা ইসলামে প্রবেশ করার মৌলিক শর্ত। আর মৌলিক শর্ত অস্বীকার করার অপর নামই হল 'কুফর'।

কুফর

কুফরের সর্বোত্তম সংজ্ঞায় সব বিতর্ক ও আপত্তির বাইরে থাকার উদ্দেশ্যে ঈমামগণ নিচের সংজ্ঞাটিকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন—

"যেসব বিষয়ের উপর ঈমান আনা অপরিহার্য তার উপর ঈমান না আনা (একেই কুফর বলে)।"[২৪]

অর্থাৎ, ইসলামের অকাট্য বিষয়গুলো যদি কেউ সজ্ঞানে অস্বীকার করে, তবে তার ঈমান নেই বলে ধরে নিতে হবে।

প্রিয় বোন। জন্মের পর থেকে শিক্ষাজীবন সমাপ্তি পর্যন্ত আমাদেরকে কত কিছু শেখানো হয়। বাংলা, অঙ্ক, ইংরেজি, ফিজিক্স, ক্যামিস্ট্রি, বায়োলজি, লিটারেচার, ড্যান্স, ড্রয়িং, অ্যাক্টিং, সিঙিং—কি শিখছে না আজকালকার ছেলেমেয়েরা? কিন্তু আফসোসের কথা কি জানেন? এতো এতো দরকারি অদরকারি শিক্ষার ভিড়ে '**ঈমান ভঙ্গের কারণ**' সম্পর্কে আমাদের একটা অক্ষর কখনো শেখানো হয়না। বাবা-মায়েদের কাছে আজকাল টাকা আর সম্মানটাই বড় হয়ে দাড়িয়েছে। ঈমান নিয়ে ভাবার সময় কই?

এর ফল হয়ে দাড়িয়েছে মারাত্মক। কুফর সম্পর্কে বেসিক ধারণা রাখা যে কেউ আশেপাশে তাকালেই দেখতে পাবে, চারিদিকে ঈমান বিধ্বংসী কথায় কিভাবে সয়লাব। আমাদের ম্যাক্সিমাম মুসলিম ভাই ও বোনেরা আজ ঈমান নিয়ে

---

[২৩] বুখারী, আস-সহীহ ১/২৭, ৪/১৭৩৩; মুসলিম, আস-সহীহ ১/৩৯, ৪০, ৪৭
[২৪] *শারহুল মাকাসিদ,* তারিফুল কুফরঃ ৩/৪৫৮ Cited in কুফর ও তাকফীর, আলী হাসান ওসামা, ৬৫, কালান্তর প্রকাশনী

চিন্তিত না। ইসলামের কোন অকাট্য বিধান যদি তাদের পছন্দ না হয়, তাহলে মুহূর্তের মধ্যে তারা সেই বিধানকে অস্বীকার করে ফেলে।

তার ঈমানের ব্যাপারে শঙ্কিত হয়ে আপনি যদি তাকে সালফে সালেহীনদের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, "এই কথাটি বলো না। এটি ঈমান নষ্ট করে দেয়", তাহলে সে আপনার দিকে তাকিয়ে বিদ্রূপ আর তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে বলবে, "ওহ, তুমি চুপ করো তো। আমার ঈমান যথেষ্ট শক্ত।"

মোট কথা, পুরো মুসলিম উম্মাহতেই আজ কুফরি সম্পর্কে অজ্ঞতায় ছেয়ে গেছে। আলেমরাও আজ আর আগের মতো সুস্পষ্ট করে ঈমান আর কুফরির পার্থক্য স্পষ্ট করে দেন না। তাই তো কারো কথাবার্তায় যদি এটি সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, সে ইসলামের উপর ঈমান রাখে না, তবুও আমরা জোর করে ঐ বান্দাকে 'মুসলিম' প্রমাণ করতে চাই। কখনো কখনো তো দেখা যায়, কোন কাফির মৃত্যুবরণ করলেও মুসলিমরা তার রূহের শান্তির জন্য দুআ করছেন!

তাই বেগম রোকেয়া মুসলিম না কাফির, এটা জানার জন্য চলুন আলিমদের ইলমের শরণাপন্ন হই। নিজেদের অল্পজ্ঞানের উপর ভরসা করার চাইতে বরং এটাই আমাদের জন্য সবচাইতে নিরাপদ পথ।

রাসূল সাঃ-কে অস্বীকারের কুফর

বেগম রোকেয়া রাসূল সাঃ-কে মিথ্যাবাদিতা ও ভন্ডামির অপবাদ দেন। অর্থাৎ, তিনি '**লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ**'[২৫], এই কালিমার দ্বিতীয় অংশ—অর্থাৎ "**মুহাম্মাদ সাঃ আল্লাহর প্রেরিত রাসূল**"—তাতেই তিনি বিশ্বাস করতেন না। যে ব্যাক্তি কালিমার শিক্ষাকে (অর্থাৎ, রাসূল সাঃ আল্লাহর নবী) মিথ্যা প্রতিপন্ন করে, এমন ব্যাক্তি মুসলিম না কাফির?

---

[২৫] আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই, মুহাম্মাদ সাঃ আল্লাহর প্রেরিত রাসূল

❑ *আল ফিকহুল আকবার*-এর ব্যাখ্যা গ্রন্থে ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর (রহিমুল্লাহ) বলেন,

“আল-ঈমান বিল্লাহ বা আল্লাহে বিশ্বাস অর্থ আল্লাহর তাওহীদে বিশ্বাস। ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ সাঃ বলেন,

তোমরা কি জান ঈমান বিল্লাহ বা আল্লাহে বিশ্বাস কি... এ কথার সাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ বা মাবূদ নেই এবং মুহাম্মাদ সাঃ তাঁর রাসূল। অন্য বর্ণনায়ঃ আল্লাহ ছাড়া তার কোনো উপাস্য নেই, তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নেই এবং মুহাম্মাদ তাঁর বান্দা ও রাসূল।”[২৬]

অর্থাৎ, আল্লাহর উপর বিশ্বাসের শর্ত হল রাসূল সাঃ-কে বিশ্বাস করা। যে ব্যাক্তি রাসূলকে বিশ্বাস করবে না, সে প্রকারান্তরে আল্লাহকেই অস্বীকার করল।

❑ বাংলাদেশের অন্যতম ওস্তাদ মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুল মালেক বলেন,

“ইসলামের নবী (কিংবা ইসলামের কোন নিদর্শন) সম্পর্কে কটূক্তিকারী, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কিংবা কোন বিধানের অবজ্ঞা ও বিদ্রুপকারী যদি মুসলিম পরিবারের সন্তান হয়, মুখে কালিমা পাঠকারীও হয়, **তবুও সে কাফির ও মুসলমানের দুশমন**। শরীয়তের পরিভাষায় এই প্রকার কাফিরের নাম ‘মুনাফিক’, ‘মুলহিদ’ ও যিনদীক।

এই স্পষ্ট বিধান এখন এজন্যই বলতে হচ্ছে যে, আমাদের সমাজে এমন লোকদের কুফরী কর্মকাণ্ড থেকেও বারাআত (সম্পর্কহীনতা) **প্রকাশ নিজের ঈমান রক্ষার জন্য অপরিহার্য মনে করা হয় না; বরং এদের সাথেও মুসলমানের**

[২৬] আল ফিকহুল আকবার, ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, ১৬৪-১৬৫, As-sunnah Publications

মতো আচরণ করা হয়, এদের প্রশংসা করা হয়, **এদেরকে 'জাতীয় বীরে' পরিণত করার চেষ্টা করা হয়**।”[২৭]

অর্থাৎ, রাসূলকে অস্বীকার করে যতই কুরআন হাদিস আর সলাত আদায় করুক না কেন, সেই ইবাদত তাকে মুরতাদ থেকে মুসলিম বানিয়ে দিবে না।

রিসালাত অস্বীকারের কুফর

এটা তো সুস্পষ্ট, বেগম রোকেয়া রাসূল সাঃ, ঈসা আঃ সহ **সকল নবী-রাসূলদের নুবুওয়াত অস্বীকার করেছেন, তাদেরকে মিথ্যাবাদী বলেছেন**। এ প্রসঙ্গে সম্মানিত আলিমগণের বক্তব্য চলুন জেনে নিই—

❑ আল্লামা কাশ্মীরি রহ. বলেন, “আমি হাফিজ ইবনু তাইমিয়া রহ.-এর *আস-সারিমুল মাসলুল আলা শাতিমির রাসূল* কিতাবের কয়েকটি সঞ্চয়ন উক্ত মাসআলার ক্ষেত্রে উপস্থাপন করছি। আর তা হলো,

নবী-রাসূলগণের দোষত্রুটি তালাশ করা এবং তাদেরকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা পরিষ্কার কুফর; বরং সবচে বড় কুফর। ইবনু তাইমিয়া রহ. তার উক্ত কিতাবে এ বিষয়ে সবিস্তর আলোচনা করেছেন এবং আলোচনাটিকে কুরআন, হাদিস, ইজমা ও কিয়াসভিত্তিক দলিল-প্রমাণ দ্বারা অত্যন্ত শক্তিশালী করেছেন।... (**যে নবী-রাসূলদের দোষ-ত্রুটি খুঁজবে, তুচ্ছতাচ্ছিল্য করবে**) তাকে তাওবা করতে আদেশ দেয়া হবে কি না এবং পার্থিব বিষয়ে তার তাওবা কবুল করা হবে কি না, এ বিষয়ে আলিমগণের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে। কিন্তু **তার কাফির হওয়ার ব্যাপারে কারো কোন মতানৈক্য নেই**।”[২৮]

---

[২৭] ঈমান সবার আগে, মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুল মালেক, ২১, মাকতাবাতুল আশরাফ
[২৮] ইকফারুল মুলহিদিন, আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরি, ২০৪, Darul Arqam

আল্লামা কাশ্মীরি রহ. 'ইতহাফ' কিতাবে আরও লিখেন,

"**কোন নবীর** প্রেরিত হওয়া এবং তার দাওয়াত ও তাবলীগকে **মিথ্যায়ন করা** যুক্তিযুক্তভাবে একটি মন্দ কাজ। তাই তার কুফরটা যুক্তিগত মন্দ সংক্রান্ত **কুফরের অন্তর্ভুক্ত** হবে।"[২৯]

অর্থাৎ, নবী-রাসূলগণের নামে মিথ্যাচার ও ভণ্ডামির অপবাদ দিলেও তাকে মুসলিম বলার কোন সুযোগ নেই।

আসমানি কিতাব, আখিরাত অস্বীকারের কুফর

❑ *আল ফিকহুল আকবার*-এর ব্যাখ্যা গ্রন্থে তাকফীরের ব্যাপারে বহু সতর্কতামূলক কথা ও হুশিয়ারি উচ্চারণ করার পরও ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর (রহিমুল্লাহ) শেষ পর্যন্ত এ কথাই বলেন যে,

"মুসলিম নামধারী ব্যাক্তিকে 'কাফির' বলা মূলত নির্ভর করে তার স্বীকৃতির উপর। যদি সে তাওহীদ, রিসালাত বা আরকানুল ঈমানের মৌলিক কোন বিষয়কে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় অস্বীকার করে তাহলে তাকে কাফির বলে গণ্য করতে হবে।"[৩০]

এর থেকে সহজ করে আসলে বোঝানো কঠিন। আপনি যদি রাসূল সাঃ, কুরআন সহ সকল আসমানী কিতাবে বিশ্বাস না-ই করেন, তাহলে আর আপনি মুসলিম কিভাবে হবেন।

---

[২৯] ইকফারুল মুলহিদিন, আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরি, Darul Arqam

[৩০] আল ফিকহুল আকবার, ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, ৩২৮, As-sunnah Publications

কাদিয়ানিদের কথাই চিন্তা করুন। ওরা শুধুমাত্র 'খতমে নবুওয়াত' অর্থাৎ রাসূল সাঃ যে সর্বশেষ নবী, তা স্বীকার করে না। শুধু এই একটি কারণেই তাদেরকে ওলামায়ে কেরাম তাকফির করেছেন। অর্থাৎ, উম্মাহ এ ব্যাপারে ঐক্যমত যে, কাদিয়ানিরা মুরতাদ ও কাফির।

❑ *আল ফিকহুল আকবার*-এর ব্যাখ্যাগ্রন্থে উল্লেখ হয়েছে, ইমাম তাহাবী বলেনঃ

"যেসব বিষয় বান্দাকে ঈমানের অন্তর্ভুক্ত করেছে, এমন কোন বিষয় অস্বীকার না করলে, সে ঈমানের গণ্ডি থেকে বের হয় না।"

এ বিষয়ে মোল্লা আলী কারী রহিমাহুল্লাহ উল্লেখ করেছেন যে,

" 'আহলু কিবলা' বলতে ইসলামের মৌলিক বিশ্বাসগুলি যারা মেনে নিয়েছেন তাদেরকে বুঝানো হয়। তাওহীদ, **রিসালাত, আরকানুল ঈমান** ও **আনুষঙ্গিক সকল বিষয় যা কুরআন কারীমে সুস্পষ্ট বলা হয়েছে**, মুতাওয়াতির হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে, মুসলিম উম্মাহর সকল আলিম যে বিষয়ে একমত পোষণ করেছেন বা যে বিষয়টি মুসলিম উম্মাহর মধ্যে সুপ্রসিদ্ধ এরূপ কোনো বিষয় যদি কেউ অস্বীকার করেন বা অবিশ্বাস করেন তবে তাকে 'আহলু কিবলা' বলা হয় না...মুহাম্মাদ সাঃ-এর রিসালাতের সর্বজনীনতা বা খাতমুন নুবুওয়াত অস্বীকার করা, কাউকে কোনো পর্যায়ে তার শরীয়াহর উর্ধ্বে বলে বিশ্বাস করা, আখিরাত অস্বীকার করা — এরূপ অবিশ্বাসে লিপ্ত ব্যক্তি যদি আজীবন কিবলামুখী হয়ে সালাত পড়েন বা ইসলামের অন্যান্য বিধান পালন করেন তবুও তাকে 'আহলু কিবলা' বলা হবে না। **কারণ তিনি ঈমানই অর্জন করেননি**, কাজেই তার ইসলাম বা কিবলামুখী হওয়া অর্থহীন।"

ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর রহিমাহুল্লাহ বলেন, *আল ফিকহুল আকবার* পুস্তকে ইমামে আযম আবু হানিফা রহিমাহুল্লাহ অনেক বিষয় ব্যাখ্যা করেছেন, যার মূল কথা একটিই; ঈমানের দাবিদারকে যথাসম্ভব ব্যাখ্যা ও ওজর-অজুহাতের মাধ্যমে মুমিন বলে গণ্য করার চেষ্টা করা। কিন্তু, **যদি কেউ**

কুরআনের সুস্পষ্ট দ্ব্যর্থহীন আয়াত দ্বারা প্রমাণিত কোন বিষয় অস্বীকার করার ঘোষণা দেয় তবে সে কাফির।[৩১]

পর্দার বিধান অস্বীকারের কুফর

পর্দার ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে বহু আয়াত নাযিল করেছেন। একই সঙ্গে রাসূল সা-এর জীবনেও আমরা পর্দা প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে অসংখ্য উদাহরণ দেখতে পাই। কিন্তু বেগম রোকেয়া যা বলেছে, তা তো বলেছেই। চলুন তাহলে, পর্দাব্যবস্থার মত জরুরিয়াতে দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত একটি বিষয় অস্বীকার, তাকে হেয় করা, ঠাট্টা মশকরার ব্যাপারে আলেমগণ কি বলে দেখি,

❑ আল্লামা কাশ্মীরি রহ. *জাওহারুত তাওহীদ* গ্রন্থের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন,

“যে ব্যাক্তি আমাদের দ্বীন ও শরিয়াহর কোন আবশ্যকীয় বিষয় অস্বীকার করে, **সে কাফির**।”

এছাড়াও হাফিজ ইবনু হাজার আসকালানি রহ.-এর সঞ্চয়নসমূহ থেকে প্রমাণিত হয় যে,

“যেকোনো অকাট্য বিষয় অস্বীকার করা কুফর। এ জন্য এ ধরণের কোন শর্ত নেই যে, সে তার অকাট্যতা সম্পর্কে অবগত থাকতে হবে, তারপর সে তা অস্বীকার করবে। এরপর তাকে অকাট্য বিষয় অস্বীকারের ভিত্তিতে কাফির বলে আখ্যা দেয়া হবে। যেমনটি কোনো কোনো কল্পনাপূজারী ব্যাক্তি ধারণা করে থাকে। বরং ঐ বিষয়টির অকাট্য হওয়াই শর্ত। [চাই অস্বীকারকারী ব্যাক্তি তা জানুক বা না জানুক।] যে কেউ এমন অকাট্য [ইয়াকিনি] বিষয় অস্বীকার করবে, [সে কাফির হয়ে যাবে।] তাকে প্রথমে তাওবা করতে বলা হবে। যদি

---

[৩১] আল ফিকহুল আকবার, ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, ৩৪০, As-sunnah Publications

সে তাওবা করে, তাহলে তো ভালো। আর যদি তা না হয়, তাহলে তাকে কাফির বলা হবে...।”

❑ শায়খ তাকিউদ্দীন সুবকি রহ.-এর ভাষ্য দ্বারাও এ বিষয়টি প্রতীয়মান হয়। যা হাফিজ ইবনু হাজার রহ. *ফাতহুল বারি* গ্রন্থে উল্লেখ করেন।

শায়খ ইবনু হুমাম রহ. *মুসায়ারাহ* গ্রন্থে লেখেন, “দ্বীনের মূলনীতি এবং দ্বীনের আবশ্যকীয় বিষয়কে অস্বীকার করা সর্বসম্মতিক্রমে কুফর। যেমনঃ কেউ দুনিয়াকে অনন্ত মনে করল..., তাহলে সে সর্বসম্মতভাবে কাফির হয়ে যাবে।”

বেগম রোকেয়া পর্দাকে ‘মক্কা, মদিনা, জুজুবুড়ি, ভূত’ সহ নানা অবমাননামূলক কথা বলে কটাক্ষ করেছেন, ঠাট্টা-বিদ্রূপ করেছেন। তার ভাষায় পর্দা হল নারী জাতির পায়ের শিকল, যা তাকে স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত করে। এ ধরণের অপব্যাখ্যার ব্যাপারে মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুল মালেক তার ***‘ঈমান সবার আগে’*** বইতে বলেন,

“এইসব কুফরী ‘ব্যাখ্যা’ এবং এ জাতীয় আরো অসংখ্য ‘ব্যাখ্যা’ যার আবরণে বেদ্বিন-মুলহিদ চক্র ‘জরুরিয়াতে দ্বীন’ (দ্বীনের সর্বজনবিদিত বিষয়) ও ‘কাওয়াতিউল ইসলাম’ (ইসলামের অকাট্য বিষয়াদি)-এর অস্বীকার করে এবং সেই কুফরীকে ঢেকে রাখার অপচেষ্টা করে, এর দ্বারা তো তাদের কুফরী আরো ভয়াবহ হয়ে যায়। ‘অস্বীকারে’র সাথে ‘অপব্যাখ্যা’ যুক্ত করে নিজেদেরকে সাধারণ কাফিরের চেয়েও মারাত্মক প্রকারের কাফির—মুলহিদ, যিন্দীক ও মুনাফিকের সারিতে অন্তর্ভুক্ত করে।”

অর্থাৎ, রোকেয়ার যে ইরতিদাদ, সেটা সাধারণ কুফরী থেকেও ভয়াবহ। কারণ, নিজের আসল পরিচয় লুকিয়ে রাখার কারণে তার ব্যাপারে অসংখ্য মুসলিম নরনারী ধোঁকার শিকার হয়েছে। ফলে, তার এই ইরতিদাদগুলো আজ সাধারণ নারীদের মাঝে সয়লাব হয়ে গেছে। মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুল মালেক বলেন,

"যে কোন ইরতিদাদ সাধারণ কুফর থেকে ভয়াবহ। সাধারণ কুফর তো সত্য দ্বীন থেকে বিমুখ থাকা বা গ্রহণ না করা, কিন্তু ইরতিদাদ নিছক বিমুখতাই নয়, এ হচ্ছে বিরুদ্ধতা। সত্য দ্বীন গ্রহণ করার পর তা বর্জনের অর্থ ঐ দ্বীনকে অভিযুক্ত করা, যা নির্জলা অপবাদ। বরং ইরতিদাদ তো সত্য দ্বীনের প্রতি বিরুদ্ধতার পাশাপাশি 'ইফসাদ ফিল আরদ' (ভূপৃষ্ঠে দুষ্কৃতি)ও বটে। বিশেষত মুরতাদ (সত্য দ্বীন ত্যাগকারী) যখন কটাক্ষ-কটূক্তি এবং অবজ্ঞা বিদ্রূপে লিপ্ত হয়। এ তো সরাসরি 'মুহারিব' (যুদ্ধঘোষণাকারী) ও 'মুফসিদ ফিল আর্‌দ' (ভূপৃষ্ঠে দুষ্কৃতিকারী)।"[৩২]

রোকেয়া কেন কাফির?

অনেকে আবার বলতে পারেন, "**বেগম রোকেয়া তো ইসলামের এই এই প্রশংসা করেছে। তাহলে সে কীভাবে মুরতাদ হয়?**"

মনে এমন প্রশ্ন জাগা খুবই স্বাভাবিক। আর এমন প্রশ্ন যে পাঠকের মনে জাগবে, সেটা অবশ্যম্ভাবী। কারণ, ঈমান ভঙ্গের কারণসমূহ আমরা অধিকাংশই জানি না।

এর ব্যাখ্যা হল, ইসলামের রুকন, অকাট্য বিষয় অস্বীকার করার আগে-পরে বহু কাফির, মুরতাদ ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ে প্রশংসা করেছেন। মুসলিম হবার জন্য ইসলামের প্রশংসা শর্ত নয়। হলে আজ বহু মুরতাদ, যিনদীক জান্নাতের দাবিদার থাকতো। ইসলামে প্রবেশের শর্ত হল, ইসলামের মৌলিক রুকন এবং অকাট্য বিষয়গুলোর উপর ঈমান আনা।

❑ বাংলাদেশের অন্যতম ওস্তাদ মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুল মালেক বলেন,

---

[৩২] ঈমান সবার আগে, মাওলানা আবদুল মালেক, ৩৩, মাকতাবাতুল আশরাফ

“বিদ্বেষ ও ঈমান একত্র হওয়া অসম্ভব। যার প্রতি ঈমান থাকবে তার প্রতি ভালবাসাও থাকবে। পক্ষান্তরে যার প্রতি বিদ্বেষ ও শত্রুতা থাকবে তার প্রতি ঈমান থাকতে পারে না। **অন্তরের বিদ্বেষ সত্ত্বেও যদি মুখে ঈমান প্রকাশ করে তবে তা হবে মুনাফিকী**।

...মোটকথা, ইসলাম, ইসলামের নবী ও ইসলামের নিদর্শন ও ইসলামের বিধানসমূহের প্রতি ভালোবাসা ও ভক্তি-শ্রদ্ধা ঈমানের অপরিহার্য অংশ, যা ছাড়া ঈমান কল্পনাও করা যায় না। আর এইসব বিষয়কে অবজ্ঞা, বিদ্রূপ করা, বিদ্বেষ পোষণ করা, এমনকি অপ্রীতিকর মনে করাও কুফরী ও মুনাফিকী। এই মানসিকতা পোষণকারীদের ঈমান-ইসলামের সাথে বিন্দুমাত্র সম্পর্ক নেই।

...ঈমান সাব্যস্ত হওয়ার জন্য ইসলামের সকল অকাট্য বিধান ও বিশ্বাসকে সত্য মনে করা এবং কবুল করা অপরিহার্য। এর কোন একটিকে অস্বীকার করা বা কোন একটির উপর আপত্তি তোলাও ঈমান বরবাদ হওয়ার জন্য যথেষ্ট। যেমন অযু হওয়ার জন্য অযুর সবগুলো ফরয পালন করা জরুরী, কিন্তু তা ভেঙে যাওয়ার জন্য অযুভঙ্গের সবগুলো কারণ উপস্থিত হওয়া জরুরী নয়। যে কোনো একটি কারণ দ্বারাই অযু ভেঙে যায়। তদ্রূপ ঈমান তখনই অস্তিত্ব লাভ করে যখন ইসলামের সকল অকাট্য বিধান ও বিশ্বাস মন থেকে কবুল করা হয়। পক্ষান্তরে এসবের কোন একটিকেও অস্বীকার করার দ্বারা ঈমান নষ্ট হয়ে যায়।

...আর অবজ্ঞা ও বিদ্রূপ তো এতোই ভয়াবহ যে, তা শরয়ী দলিলে প্রমাণিত ছোট কোন বিষয়ে প্রকাশিত হলেও সাথে সাথে ঐ ব্যাক্তির ঈমান শেষ হয়ে যাবে এবং তার উপর কুফরের বিধান আরোপিত হবে।

...আকাইদ ও আহকামের বিদ্রূপ কিংবা অস্বীকার তো এজন্যই কুফর যে, তা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য বর্জন এবং তাঁদের প্রতি ঔদ্ধত্য প্রকাশ। সুতরাং গোটা ইসলামকে অস্বীকার বা বিদ্রূপ করা আর ইসলামের কোন একটি বিষয়কে অস্বীকার বা বিদ্রূপ করা একই কথা! উভয় ক্ষেত্রে একথা বাস্তব যে, ঐ ব্যাক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে এবং ঔদ্ধত্য ও

বিরুদ্ধতা প্রকাশ করেছে। ইবলীস তো কাফির মরদূদ হয়েছিলো একটি হুকুমের উপর আপত্তি করেই।

...ইরশাদ হয়েছে-

যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলগণকে অস্বীকার করে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলগণের মধ্যে পার্থক্য করতে চায় এবং বলে, আমার কতক (রাসূল)-এর প্রতি তো ঈমান রাখি এবং কতককে অস্বীকার করি। আর (এভাবে) তারা (কুফর ও ঈমানের মাঝে) মাঝামাঝি একটা পথ গ্রহণ করতে চায়।

এরূপ লোকই সত্যিকারের কাফির। আর আমি কাফিরদের জন্য লাঞ্ছনাকর শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছি।

যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনবে এবং তাদের কারো মধ্যে কোনো পার্থক্য করবে না, আল্লাহ তাদেরকে তাদের কর্মফল ডান করবেন। আল্লাহ অতিশয় ক্ষমাশিল, পরম দয়ালু।”[৩৩]

(সূরা নিসা ০৪:১৫০-১৫২)

রোকেয়ার কুফরে আকবার

❑ ‘কুরআন-সুন্নাহর আলোকে ইসলামী আকীদা’ বইতে আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর বলেন,

‘আল্লাহ তাআলা ও তাঁর রাসূলের উপর এবং ঈমানের রুকনগুলিতে বিশ্বাস না থাকাকেই ইসলামের পরিভাষায় ‘কুফর’ বলে গণ্য।’

---

[৩৩] ঈমান সবার আগে, মাওলানা আবদুল মালেক, মাকতাবাতুল আশরাফ

কুফর আবার দুই প্রকার। বড় কুফর ও ছোট কুফর। বড় কুফর অর্থাৎ কুফরে আকবারের সংজ্ঞায় ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর (রহিমুল্লাহ) বলেন,

'কুফরে আকবার বলতে প্রকৃত অবিশ্বাস বুঝানো হয় যা সংশ্লিষ্ট ব্যাক্তিকে ইসলাম থেকে বের করে দেয় এবং প্রকৃত অবিশ্বাসী বা কাফিরে পরিণত করে।'[৩৪]

বেগম রোকেয়া যেসব কুফরীতে লিপ্ত ছিলেন, সেগুলো মারাত্মক পর্যায়ের কুফরে আকবার। যেমন ধরুন,

'মুহাম্মাদ সাঃ-এর ব্যাক্তিত্ব, মর্যাদা, মহত্ত্ব, রিসালাত, নুবুওয়াত, নুবুওয়াতের পূর্ণতা, প্রচার ও তাবলীগের পূর্ণতা, নুবুওয়াতের বিশ্বজনীনতা, স্থায়িত্ব, সমাপ্তি, মুক্তির একমাত্র পথ ইত্যাদি কোনো বিষয়ে অস্বীকার, অবিশ্বাস বা সন্দেহ এ পর্যায়ের কুফর। মুহাম্মাদ সাঃ যা কিছু বলেছেন তার কোনো বিষয়কে মিথ্যা বা সন্দেহযুক্ত বলে মনে করাও একই পর্যায়ের কুফর।'

তাকফীরের প্রতিবন্ধকতা

❑ তাকফিরের তিনটি প্রতিবন্ধকতা রয়েছে[৩৫],

এক. অজ্ঞতা। অপ্রসিদ্ধ বিষয়ে অজ্ঞতা কাউকে তাকফির করার জন্য প্রতিবন্ধক হিসেবে গণ্য হবে। তবে, জরুরিয়াতে দ্বীন (ইসলামের অকাট্য বিধান) অস্বীকারের ক্ষেত্রে অজ্ঞতা কোন অজুহাত হিসেবে বিবেচিত হয় না। বেগম রোকেয়া রিসালাত, কিতাব, নবী-রাসূলদের সম্মান প্রদর্শন ইত্যাদি বিষয় যেভাবে অস্বীকার করেছেন, সেসবই জরুরিয়াতে দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত। তাছাড়া তিনি কুরআন ও হাদিসে বলা এই বিষয়গুলোর সবই জানতেন।

---

[৩৪] কুরআন-সুন্নাহর আলোকে ইসলামী আকীদা, ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, ৩৯৪-৩৯৫, As-sunnah Publications

[৩৫] কুফর ও তাকফির, আলী হাসান ওসামা, ১৩০, কালান্তর

‘অলংকার না badge of slavery’ প্রবন্ধে তিনি এমন অনেক কথাই উল্লেখ করেছেন, যেগুলো শুধুমাত্র কুরআন-হাদিস থেকেই জানা সম্ভব। তাই এই অযুহাত তার ক্ষেত্রে খাটে না।

দুই. বাধ্য হওয়া। কিন্তু, বেগম রোকেয়াকে কেউ কুফরে লিপ্ত হতে বাধ্য করেনি।

তিন. ব্যাখ্যা থাকা। বেগম রোকেয়ার কুফরি বক্তব্যের শরিয়াহ দ্বারা অনুমোদিত এমন কোন ব্যাখ্যা নেই, যা দিয়ে বলা যাবে—রোকেয়ার এসব কুফরি বক্তব্য কুরআন সুন্নাহর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

তিনটি ওজরের একটিও তার মাঝে খুঁজে পাওয়া যায় না। খুঁজে পাওয়ার কথা-ও না। যে মানুষটা তার সারা জীবন ব্যয় করেছে ইসলামের বিরুদ্ধে, সে যে তওবা করবে না, এতে আর অবাক হওয়ার কি আছে।

শেষ কথা

রোকেয়া প্রথম কুফরি লেখা প্রকাশ করেন ১৯০৩ সালে, ‘**অলংকার না badge of slavery**’ নামক প্রবন্ধে। তারপর ১৯০৪ সালে আবারো ‘আমাদের অবনতি’[৩৬] নামক প্রবন্ধে নবী-রাসূলদের মিথ্যাবাদী বলে অপবাদ দেন। এই সময়ের আগে-পরে ইসলামের পক্ষে অনেক কথা লিখেছেন তিনি। এর মাঝে বিভিন্ন লেখায় চতুরতার সঙ্গে পরোক্ষভাবে এমন সব ইসলাম-বিদ্বেষী লেখা লিখেছেন, যা দিয়ে তার বিরুদ্ধে সরাসরি ইসলাম ত্যাগের অভিযোগও তোলা যাবে না। কিন্তু মানুষের মনে ঠিকই ইসলাম নিয়ে সন্দেহ তৈরি হয়ে যাবে। মৃত্যুর পূর্বে ‘**অবরোধ-বাসিনী**’ বইতে আবারো তিনি

[৩৬] পরে প্রবন্ধটি ‘স্ত্রীজাতির অবনতি’ নামে মতিচূর বইতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

ইসলামের জরুরিয়াতে দ্বীন ‘পর্দাব্যবস্থা’ নিয়ে নিকৃষ্ট পর্যায়ের ঠাট্টা মশকরা করেন, যা সুস্পষ্ট কুফরি।

কেউ কেউ বলতে পারে, রোকেয়া পরবর্তী জীবনে মুসলিমদের জন্য অনেক কিছু করেছেন। তিনি মুসলিম নারীদের ‘স্বাধীনতা’ আদায়ে জীবন উৎসর্গ করেছেন। এভাবে তিনি ইসলামের পক্ষে জীবনযাপন করেছেন। হয়তো তিনি মনে মনে তওবা করেছেন।

নাহ বোন। ইসলাম এভাবে কাজ করে না। রাসূল সাঃ, সাহাবী, তাবিঈ, তাবি তাবিঈ—মোট কথা মুসলিমরা কখনোই প্রকাশ্য মুরতাদকে মনে মনে মুসলিম ভাবেননি। ঈমান ও কুফরের ক্ষেত্রে বাহ্যিক দিকটাই বিবেচিত হবে। কে মনে মনে তওবা করল বা ইসলাম ত্যাগ করল, সেটা আমরা তার অন্তর চিরে যাচাই করতে পারব না। তাই কেউ যদি সুস্পষ্টভাবে ইরতিদাদে লিপ্ত হয়, তাহলে এরপর সারাজীবন একটানা সলাত, যাকাত, হজ্জ আর অন্যান্য ইবাদত করে গেলেও তাকে কাফির হিসেবেই গণ্য করা হবে, যদি না সে প্রকাশ্যে তওবা করে থাকে।

অর্থাৎ, রোকেয়াকে তাকফীর করার কোন প্রতিবন্ধকতা নেই। বেগম রোকেয়া সুস্পষ্টভাবে ইসলামের গণ্ডির বাইরে। এবং ওই অবস্থাতেই তিনি বাংলার মুসলিম নর-নারীদেরকে বিভ্রান্ত করে গেছেন। এমন একজন মুরতাদের জন্য দুআ করা, জান্নাত কামনা করা জায়েয নয়। তার মত সুস্পষ্ট মুরতাদকে [তার ইরতিদাদ সম্পর্কে জানার পরও] মুসলিম মনে করাও কুফরি।

এই পর্যন্ত আমরা যা দেখলাম, তার উপর ভিত্তি করে বলা যায়, বেগম রোকেয়া তার জীবদ্দশায় বেশ কয়েকটি গুরুতর, ভয়ংকর কাজে লিপ্ত ছিলেন। বিজ্ঞ আলিমদের মতে, যার সবই সরাসরি ঈমানের গণ্ডি থেকে বের করে কাফির বানিয়ে দেয়। যেমন—

- রাসূল সাঃ-কে মিথ্যুক, ভণ্ড ও স্বেচ্ছাচারী দাবি [সুস্পষ্ট কুফর]
- ঈসা আঃ-কেও একইভাবে সুচতুর মিথ্যুক দাবি [সুস্পষ্ট কুফর]

- সর্বোপরি, সকল নবী ও রাসূলদের ভণ্ড ও মিথ্যুক দাবি [সুস্পষ্ট কুফর]
- কুরআনসহ সকল আসমানি কিতাবকে, আল্লাহর বিধানসমূহকে মিথ্যা, ভুয়া দাবি [সুস্পষ্ট কুফর]
- জাহান্নাম তথা আখিরাতকে অস্বীকার [সুস্পষ্ট কুফর]
- পূর্বের সকল নবী এবং রাসূল সাঃ-এর সাহাবীদেরকে অসভ্য, বর্বর, বুদ্ধিহীন, মূর্খ বলে কটূক্তি [সুস্পষ্ট কুফর]
- আদম আঃ ও হাওয়া আঃ সম্পর্কে কুরআনের স্পষ্ট ঘোষণা সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ [ব্যাখ্যাসাপেক্ষ]
- দ্বীন ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ বিধান (পর্দা) সম্পর্কে বিদ্বেষ পোষণ [সুস্পষ্ট কুফর]
- দ্বীন ইসলামের বিধান (পর্দাব্যবস্থা) নিয়ে ঠাট্টা-মশকরা [সুস্পষ্ট কুফর]

অর্থাৎ, রোকেয়ার সকল কথা আর দাবি আমাদেরকে একটি উপসংহারে নিয়েই কেবল দাড় করায়। সেটি হল, রোকেয়া ছিলেন ইসলামবিদ্বেষী মুরতাদ, কাফির। এতে সন্দেহের কোন অবকাশই নেই। ঈমান বিষয়টা কোন পুতুল খেলা না যে, কেউ রাসূল সাঃ-কে মিথ্যাবাদী বলল, আর আমরা তাকে ঠেলেঠুলে জান্নাতে পাঠিয়ে দিতে পারবো। আল্লাহ তাআলা এই সত্যকে গ্রহণ করার জন্য আমাদের অন্তরকে প্রসারিত করে দিন।

আমাদের উপর ইতিহাসের কিছু দাবি রয়েছে। ইতিহাস তার শিক্ষা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, আমাদের কাজ হল সেটা গ্রহণ করা। শিক্ষাটা হল, ভ্রান্ত কোন মানুষকে অনুসরণ করার ফলাফল সবসময় ভয়ানক হয়ে থাকে। তাই, বেগম রোকেয়ার মত এমন একজন মুরতাদকে পুরো জাতির ন্যাশনাল আইডল ও অগ্রদূত বানিয়ে আমাদের কোমলমতি শিশু-কিশোরদের মস্তিষ্ক যেভাবে বিকৃত করে দিচ্ছে, তার একটা প্রতিবাদ করা আমাদের উপর অত্যাবশ্যক ছিল।

কিন্তু, গত একশো বছরেও তেমন কিছুই আমার চোখে পড়েনি। অথচ এই মহিলার নাম ব্যবহার করে কোটি কোটি মুসলিম বোনের মাথায় পর্দা-বিদ্বেষ, ধর্ম-বিদ্বেষ পুশ করা হচ্ছে। তাই, নিজের ঈমানি দায়িত্ব হিসেবেই রোকেয়ার আসল রূপটা সকলের সামনে তুলে আনার এই চেষ্টা।

প্রিয় ভাই/বোন। আপনার কাছে আমার অনুরোধ কিংবা দাবি, সত্যকে চিনুন। সত্যকে জানুন। ইসলামবিদ্বেষীদেরকে মাথায় তুলে নাচার মত ভয়ঙ্কর পথ থেকে নিজে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখুন। আর কাছের, দূরের আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবদেরকেও সতর্ক করুন। সবাইকে জাহান্নামের পথ থেকে ফিরিয়ে আনুন। আপনি যদি সত্যকে চিনতে পারেন, তাহলে এই কাজ আপনার দায়িত্ব। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে শিখিয়ে দিয়েছেন, প্রত্যেকে যেন তার প্রিয়জনকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করার চেষ্টা করে।

আপনার কোন ভাই, বোন বা আত্মীয় যদি রোকেয়াকে আইডল মানে, বা পর্দাব্যবস্থা বা দ্বীনের ব্যাপারে ধোঁকায় পড়ে, তাহলে তাকে এই বইটি পড়তে দিন। তার চাইতেও গুরুত্বপূর্ণ, পর্দা সম্পর্কে বিশ্বস্ত একজন আলিমের বই পড়তে দিন। কিংবা কোন আলিমা-র কাছে গিয়ে ইসলামের বেসিক নলেজ অর্জনের বজ্রকঠিন সিদ্ধান্ত নিন। আমার বিশ্বাস, এই বইটুকু যেহেতু আপনি কষ্ট করে পড়েই ফেলেছেন, তাহলে বাকিটুকুও আপনি পারবেন ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ আপনার জন্য অপেক্ষা করছেন বোন। আপনি কি ফিরবেন না আপনার রবের পথে?